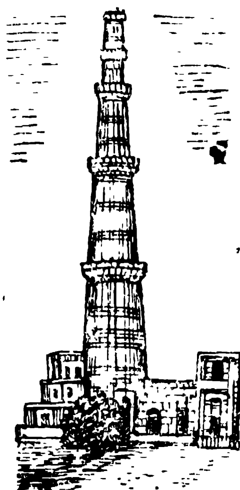
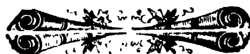
ডিলিরিয়াম

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূচনা ও অবসান

প্রথম প্রকাশ— এপ্রিল, ১৯৪৭
প্রকাশক ডাঃ গোপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ডি, এম, এস, (কলিকাতা)



শহীদ মিনার



অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যজ্ঞের হোতা, নির্ভীক দেশ প্রেমিক দেশ নেতা ও মুক্তি যুদ্ধের শহীদ বৃন্দের অমর আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য।

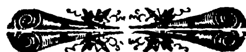
শ্রদ্ধাবনতঃ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ডিলিরিয়াম

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূচনা ও অবসান।





১৬ই আগষ্ট (১৯৪৬) ভারতবর্ষে মুসলিম লীগ নেতা মিঃ জিন্নার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় দেশের সর্ব্বত্র আতঙ্ক-আলোড়নের সৃষ্টি হয়। আমরা সকলে গ্রামান্তরিত হয়ে দীর্ঘকাল কর্ম্ম বিরত অবস্থায় পড়ি। তখন আমাদের নিত্যকার কাজ হয়—কাগজ পড়া, রেডিও শোনা ও রোজ রাত জেগে পাড়া-পাহারা দেয়া।

দেশের এ ধরণের অবস্থার মধ্যে পড়ে আপনা হতেই আমার মাথায় নানা রকমের চিন্তা আসতে থাকে। চিন্তাগুলি লিপিবদ্ধ করে দেখলুম—কতকটা যেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রূপে ফুটে উঠেছে। কিন্তু ইতিহাস লেখা অত সহজ কাজ নয়। আর প্রকৃত সত্য ইতিহাস লেখা খুবই কঠিন। তাই কোন কালেই প্রকৃত সত্য ঘটনার ইতিহাস লেখা যায়নি এবং কোনদিন তা' লেখা যাবে কিনা জানিনা। কারণ—সত্য ঘটনা জানার পক্ষে যেমন আছে নানা বাধা, তেমন নিরপেক্ষ ভাবে লেখার মধ্যেও আছে অনেক বিপত্তি। তার ওপর থাকে এক দিকে রাজরোষ ও অপর দিকে শক্তিমান দলের রক্তচক্ষু। এর কোনটাই একেবারে উপেক্ষার নয়।

তাই চলতি ইতিহাস লেখার মধ্যে কিছু না কিছু জনশ্রুতি এসে, আপনা হতেই ইতিহাসের পাতায় আশ্রয় নেয়। আমার এ গ্রন্থলেখার মধ্যেও তা' হয়েছে ·

গ্রন্থটি প্রবন্ধ আকারে লেখা হলেও এ না-হয়েছে ইতিহাস, না-কাল্পনিক গল্প, না-উপন্যাস, না-নাটক। অথচ এ সবেরই কিছু কিছু ছোঁয়াচ লেগেছে। তাই গ্রন্থটির নাম দিয়েছি 'ডিলিরিয়াম'।

গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণে আলোচনার কিছু বিস্তৃতি লাভ ঘটেছে। তাই ভারত স্বাধীন হবার পরের ঘটনাও যেমন ক্ষেত্র বিশেষে সংযোজিত হয়েছে, তেমন এর মধ্যেই আছে শক্তিমান মহান্ পুরুষদের স্মৃতি চারণ

ও অতীত যুগের নিষ্ঠুর নিহত বাস্তব কাহিনী। যাকে বলে, একাধারে জ্বলন্ত দেশ-প্রেম, আর জঘন্য বিশ্বাস ঘাতকতা।

তথাপি ঘটনাটি সকলের সহজ অবগতি ও সুখ পাঠ্যের জন্য গ্রন্থটির স্থানে স্থানে গল্পাকারে লেখার সঙ্গে অভিনব নাটকীয় রস-সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থটি রাজনীতির পূর্ণ ধারাবাহিক ইতিহাস না হলেও ঘটনা স্রোতের মধ্যে দেশনেতাদের বিশেষ অবদানের অন্তর্নিহিত ধারার কিছু কিছু পরিচয় আছে। গ্রন্থটি পাঠক বর্গের উপভোগ্য হলে ও ভাবীকালের ছেলে-মেয়েদের কিছু কাজে লাগ্‌লে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

আর একটি কথা, বালক কম্পোজিটার কারণে গ্রন্থটির মধ্যে অনেকগুলি ছাপার ভুল-ভ্রান্তি ঘটে গিয়েছে। এর জন্যে পাঠকদিগের নিকট আমি অতি বিনীত ভাবেই ত্রুটি স্বীকার করছি।

ইতি—

বশংবদ গ্রন্থকার

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদ কুটীর

৭৮, সূর্য্যসেন রোড,

কলিকাতা—৭০০ ০৩৫

—ঃ গ্রন্থকারের যে পুস্তক গুলি পুনর্মুদ্রিত হবে ঃ—

অনুভব ঃ— খণ্ডকাব্য, অধ্যাত্ম চিন্তা।

চলচ্চিত্র ঃ— সামাজিক নাটক।

রহস্য ময়ী নারী ঃ— বিবিধ প্রবন্ধ।

আয়ুর্ব্বেদের দ্বিতীয় জ্ঞাতব্য (গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা)।

—বহু প্রশংসিত গ্রন্থটি সংগ্রহ করুন—

॥ আয়ুর্ব্বেদের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য ॥

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার / সংস্কৃত বুক ডিপো / ভারত সাহিত্য ভবন / দি বুক হাউস / মহেশ লাইব্রেরী, কলিকাতা।

ভারত সরকারের **পঞ্চ বার্ষিকী** পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক যথাযথ সাহায্য প্রদত্ত হলে, সরকারী অর্থানুকূল্যের দরুণ পুনর্মুদ্রনে গ্রন্থটি অতি স্বল্প মূল্যে সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব হ'বে।

কৃতজ্ঞতা

এই গ্রন্থটির বিস্তৃত আলোচনার পক্ষে যে সকল পুস্তকের কিছু কিছু সাহায্য নিয়েছি, তা'হোল সর্ব্বশ্রী গোলাপ চন্দ্র রায়চৌধুরী ও কৌশাম্বীনাথ মল্লিক রচিত 'ইতিহাস', ডঃ রনজিৎ কুমার দাসের 'ভারত জন পরিচয়', ডঃ কিরণ চন্দ্র চৌধুরীর 'স্বদেশ কথা', প্রতিভা মৈত্রের 'ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ' প্রকাশক সুনীল বসুর 'মুজফ্‌ফর আহম্মদ স্মরণে', এ সকল গ্রন্থকার ও প্রকাশক আমার শ্রদ্ধাভাজন ও সকলেই আমার নমস্য।

গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রণে যিনি সর্ব্ব সহযোগিতা করেছেন তিনি আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীঅমিয় কুমার সেনশর্ম্মা। এঁর অকপট সহৃদয়তার জন্য আমি মুগ্ধ।

এ ছাড়া পরম স্নেহের 'যুগসংশপ্তক' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীকমল বরণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, এ্যাড্‌ভোকেট্‌ মহাশয় এবং 'মৃগণা' পত্রিকার সম্পাদক ও 'গীতা মঞ্জুষা' গ্রন্থ প্রনেতা শ্রীসত্যদাস মঙ্গল মহাশয় দ্বয় এই গ্রন্থটি মুদ্রণে উৎসাহিত করায় আমাকে চির আত্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। ইতি—

বশংবদ

গ্রন্থকার।

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূচনা ও অবসান।

সূচী-পত্র

বিষয়—	পৃষ্ঠা
ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূচনা—	১
ভারতে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ—	৯
গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ও কমিউনিষ্ট পার্টি—	২০
রাসবিহারীর ভারত ত্যাগ ও গান্ধীজীর প্রত্যাবর্ত্তন—	৩০
নেতাজীর আজাদী সংগ্রাম ও কলকাতায় দাঙ্গা—	৩৯
দাঙ্গার বিস্তৃতি ও সন্ত্রাসবাদী দল—	৪৯
গান্ধীজীর রাজনীতি ও চট্টোগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন—	৬৩
লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক—	৬৯
পাকিস্তান পরিকল্পনা ও লাহোর অধিবেশন—	৭৯
সুভাষের ভারত ত্যাগ ও রাসবিহারীর কার্য্যোদ্ধার—	৮৭
ক্রীপস্ মিশনের সিমলা বৈঠক পণ্ড।	৯২
ভারতছাড় আন্দোলন ও বেঙ্গল ভলিন্টিয়ার্স—	৯৭
রসিদ আলির মুক্তি দিবস পালন—	১০৫
কলকাতায় হাঙ্গামা—	১১১
কু-সংস্কার বর্জ্জনে মিঃ জিন্না—	১১৯
গান্ধীজীর নোয়াখালি পরিদর্শন—	১২৫
নৌ-ধর্ম্মঘট ও ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট গঠন—	১৩৪
ভারতে ইংরাজ রাজত্বের অবসান—	১৪১

প্রথম পর্ব্ব

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূচনা

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূচনার কথা বলতে গিয়ে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ পত্তনের কথা আগে বলতে হচ্ছে। তাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম কাহিনী এখানে উপস্থাপনা করা হল, গত অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে।

১৭০৪ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন মুকসুদাবাদে। দেওয়ানের নামানুসারে মুকসুদাবাদের নতুন নাম হল মুর্শিদাবাদ। এরপর থেকেই শুরু হল মুর্শিদাবাদের নবাবী মহলের ইতিহাস। আরম্ভ হল রাজনৈতিক উত্থান পতনের লীলা-খেলা।

দাক্ষিণাত্যের কোন এক ব্রাহ্মণ পরিবারে মুর্শিদকুলি খাঁর জন্ম হয়। গরিব ব্রাহ্মণের অনাথ ছেলে, ক্রীতদাস রূপে আশ্রয় পায় এক মুসলমান পরিবারে। সেখানেই ইস্‌লাম ধর্ম্মে তাঁর দীক্ষা। পরে মোগল বাদশাহের কোষাগারে সামান্য বেতনের চাকুরী পান। তারপর নিজের কর্ম্ম দক্ষতা আর বুদ্ধি বলে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে, হলেন বাংলার দেওয়ান। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসলেন প্রথম নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ। এঁর দেওয়ানীর কাজ ভাল জানা ছিল। জানতেন এর কোথায় ফাঁকি। তাই নবাব হয়েই রাজ কাজে মন দিলেন। রাজস্ব আদায়ের পাকা বন্দোবস্ত হল। আয় বাড়ল। সে সময়ে দেশের জনসাধারণ ও প্রজাকুল ছিলেন বেশ সুখেই। তখন টাকায় পাঁচমন চাল ও টাকায় পনের সের গাওয়া ঘি পাওয়া যেত। তখনকার দিনে মাসে চারটাকা আয় থাকলে দু'বেলা পোলাও কালিয়া খাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু আজ কত পরিবর্ত্তন।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর মসনদে বসলেন তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন। ইনি ছিলেন যেমন বিলাসী আর তেমনি দান শীল। এঁর আমলেই আলিবর্দ্দি খাঁ বিহারের শাসন কর্ত্তা ছিলেন।

নবাব সুজাউদ্দিন নগরের বাইরে কোথাও গেলে এক বিশাল শোভা-যাত্রা সহকারে তিনি যেতেন। পদাতিক ও অশ্বারোহী মিলিয়ে তাঁর সঙ্গে থাকতো প্রায় পঞ্চাশ হাজার। এছাড়া, হাতী, ঘোড়া, উট এবং সেই সঙ্গে আমীর ওমরাহরাও থাকতেন। হাতীর পিঠে চড়ে, বহুমূল্য রত্ন হীরক খচিত পোষাক পরে নবাব অর্থবৃষ্টি করতে করতে যেতেন।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর পুত্র সরফরাজ নবাব হলেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নবাব সরফরাজের সঙ্গে আলিবর্দ্দির যুদ্ধ হয়। মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে গিরিয়ার প্রান্তরে সরফরাজ যুদ্ধে প্রাণ হারালেন। পরে আলিবর্দ্দি দিল্লীর বাদশা মুহম্মদশাকে চুরাশি লক্ষ টাকা নজরানা দিয়ে বাংলার নবাবী পরোয়ানা পেয়েযান। আলিবর্দ্দি খাঁ সাহসী যোদ্ধা ও রাজকার্য্যে দক্ষ ছিলেন। ইনি স্বাধীন রাজার মত রাজ্য পরিচালনার সকল দায়িত্ব, শেষে নিজের হাতেই তুলে নেন। এঁর ঘরোয়া জীবন ছিল সু-সংযত। ইনি প্রতাপশালী নবাব হয়েও শেষ পর্য্যন্ত একটি স্ত্রীর স্বামী হয়েই জীবন কাটিয়ে ছিলেন। নবাবী আমলে এরূপ দৃষ্টান্ত একেবারেই বিরল।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ১০ই এপ্রিল তারিখে ভোর পাঁচটায় কলমা পড়তে পড়তে আলিবর্দ্দি খাঁ মহাবত জংবাহাদুর আশি বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন এবং মৃত্যু কালে নবাব আলিবর্দ্দি তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা আমিনার পুত্র সিরাজ-দ্দৌলাকে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। ইতিমধ্যে সিরাজের মেজমাসীর পুত্র পূর্ণিয়ার সৌকত জঙ্গ, দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে সনদ এনে নিজেকে বাংলার সুবেদার বলে ঘোষণা করলেন। সিরাজদ্দৌল্লা একথা শোনার পর সুবিধামত একদিন সৌকতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা ক'রে সৌকতকে যুদ্ধে নিহত করেন।

সিরাজের এইরূপ ঔদ্ধত্ব পূর্ণ কাজে সিরাজের বড়মাসী ঘসেটি

বেগম রাগে একেবারে জ্বলে উঠলেন এবং ভেতরে ভেতরে সিরাজের প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। এই ঘসেটি বেগমের উস্কানীতে বয়স্ক রাজ কর্ম্মচারী সিরাজের পতনের জন্য গোপন-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। নবাবের নামে মিথ্যা অপবাদ ও অপপ্রচার করে কুটিল চক্রান্ত চালাতে লাগলেন। এর ফলে দেশের লোক ক্রমশঃ নবাবের ওপর বিরাগ ভাজন হয়ে উঠতে লাগলেন। ঘসেটি বেগম, রাজা রাজবল্লভ, মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উমী চাঁদ মিলে সিরাজকে বাংলার মসনদ হতে অপসারণ করার জন্যে শেষে বনিক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহেবদের সঙ্গে মিশে গেলেন।

প্রধান সেনাপতি জনাব মিরজাফরের কু-চক্রান্তের সব কিছু একদিন নবাবের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। নবাব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মনে মীরজাফরকে বন্দী করতে চেয়েছিলেন। নবাবের এরূপ ভাবগতিক দেখে মীরজাফর নবাবের কাছে তাঁর অন্যায় স্বীকার করেন। এবং মুসলিম ধর্ম্মগ্রন্থ 'কোরাণ' স্পর্শ করে শপথ করেন যে, নবাবের বিরুদ্ধাচারণ তিনি আর কখনও করবেন না। মীরজাফরের এরূপ আচরণে নবাব সিরাজদৌল্লা বীরপুরুষের মত তাঁর প্রধান সেনাপতি জাফর আলি খাঁর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু নবাবের এ মহত্ব ও উদারতা দুর্জ্জনেরা কেহই বুঝলেন না। তাই গোপনে গোপনে সিরাজের বিরুদ্ধে কুটিল ষড়যন্ত্র চলতেই থাকল।

দেশের এইসব বিপর্য্যয়ের সুযোগে বিদেশী বনিক ফরাসী, ডাচ, পর্ত্তুগীজ ও দেশের রাজা. জমিদার, মারাঠা সকলেই দেশের মধ্যে একের পর এক সমস্যা সৃষ্টি করে নবাবকে বিব্রত করতে লাগলেন। দেশের এই অবস্থা দেখে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজরা নবাবের আদেশ অবহেলা করতে আরম্ভ করলেন এবং কলকাতার দুর্গকে আরো সুদৃঢ় করে গড়ার কাজে লেগে গেলেন।

ইংরাজদের এরূপ ঔদ্ধত্ব পূর্ণ কার্য্যকলাপে নবাব রুষ্ট হয়ে সদলবলে ১৬ই জুন (১৭৫৬) কলকাতা জয় করতে বেরিয়ে পড়লেন। ২৫শে জুন (১৭৫৬) নবাব কলকাতা জয় করে কলকাতার নাম বদল করে, আলি

নগর রাখলেন। ১১ই জুলাই (১৭৫৬) সিরাজ সদল বলে বিজয় গর্ব্বে রাজধানী মুর্শিদাবাদে ফিরে এলেন।

অথচ কে জানতো যে আর এক বছর পরেই নবাব সিরাজদ্দৌলার ইহলোকের সকল লীলাখেলা চিরকালের জন্য শেষ হয়ে যাবে! নিয়তি কি নির্ম্মম। নবাব কলকাতা জয় করার ঠিক তু'মাস পরে কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ বম্বে থেকে মাদ্রাজে এসে নামলেন। ওয়ার্টস, ড্রেক, ডাঃ ফোর্থ, হলওয়েল সকলে এক জোটে যুদ্ধ সরঞ্জাম তোড়জোড় সব সঙ্গে নিয়ে কলকাতা জয় করতে এগিয়ে আসেন।

৩রা ফেব্রুয়ারী (১৭৫৭) আবার নবাব কলকাতা দখলে যুদ্ধ যাত্রা করেন। খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে। ৯ই ফেব্রুয়ারী (১৭৫৭) ইংরেজদের সমস্ত দাবী স্বীকার করে, নবাব সিরাজদ্দৌলা সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর দিয়ে শীল-মোহর করে দেন। নবাবের এই পরাজয়ে দেশদ্রোহী ও রাজদ্রোহী কর্ম্ম-চারীরা যেমন আনন্দিত হলেন, তেমন ক্লাইভের রাজ্য লোভ বেড়ে উঠল।

রবার্ট ক্লাইভ উমিচাঁদকে দিয়ে হুগলীর ফৌজদার মহারাজ নন্দ-কুমার রায়কে সম্ভবতঃ মোটা টাকা ঘুষ্ দিয়ে একেবারে হাত করে ফেললেন। এরপর হতেই মহারাজ নন্দকুমার রায় বিশ্বাসঘাতকদের দলে ভালভাবেই মিশে যান। তারপর থেকেই ইংরাজদের হয়ে মীরজা-ফরের কথা মত অনেক মিথ্যা খবর নবাবকে দিতে থাকেন। আর নবাব সরল বিশ্বাসে নন্দকুমারের সকল পরামর্শ অনুযায়ী আগের মতই কাজ করে যেতে লাগলেন।

২৩শে মার্চ্চ (১৭৫৭) সালের মধ্যেই ইংরেজরা বজ্‌বজ্‌, কলকাতা ও পরে চন্দননগর জয় করলেন। জানাগেছে, ইংরেজরা মাত্র কয়েকটি তোপের আওয়াজ ক'রে ও আমাদের দেশী লোকদের বিশ্বাস ঘাতকতার সঙ্গে মীরজাফরের অবলম্বনে একে একে সব জয় করলেন। চন্দননগর জয় করার পর ইংরেজদের আরো শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি হল। এরপর হতেই ইংরেজরা নবাবকে আরো বেশী করে অগ্রাহ্য করে চলতে লাগলেন।

২৩শে জুন (১৭৫৭) ভোর হতেই ভাগীরথীর তীরে পলাশীপ্রান্তরে আবার যুদ্ধ দামামা বেজে উঠল। আর সেদিন বিকেল পাঁচটার মধ্যেই সব যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল।

পলাশীর আম্রকাননে অসংখ্য দুর্দ্ধর্ষ নবাব সৈন্যের সঙ্গে রবার্ট ক্লাইভের অঙ্গুলিগন্য সৈনিকের যে খণ্ড যুদ্ধ হল, সে যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের শয়তানিতে মাত্র নয় ঘণ্টার মধ্যেই সারাদেশকে আঁধারে ঢেকে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য্য অস্ত গেল। **আর সেদিন হতেই লর্ড ক্লাইভ ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির সূচনা করলেন।** কলকাতার বুকে সেদিন ইংরাজদের বিজয়োল্লাস।

নবাবের পক্ষে মোহনলাল, মীরমদন, সিনফ্রে ব্যতীত অন্য সকল সেনা-পতি নিজ নিজ সমরবাহিনী ও সমর সম্ভার নিয়ে মীরজাফরের নির্দ্দেশে পলাশীর মাঠে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। বিশ্বাসঘাতকেরা কেউ নবাবের হয়ে বা নিজেদের মাতৃভূমি বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে একটুও যুদ্ধ করল না। যেটুকু যা'হল তা'সবই এলোমেলো অগোছাল অবস্থায়। এ না হলে নবাবকে এ সঙ্কট অবস্থায় পড়তে হত না, এঁরা তখন যুদ্ধ তামাশা দেখছিলেন।

এরপর সেনাপতি মীরমদনের মৃত্যুর সংবাদ শুনে নবাব একেবারে মুষড়ে পড়লেন। তাই আর কোন চেষ্টা না করে বিশ্বাসঘাতকদের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে বিকেল চারটা নাগাত ইংরেজরা আরো এগিয়ে আসছে দেখে নবাব এক জোর চলিয়ে তেজী উঠের ওপর চড়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে চট্পট্ রাজধানীর দিকে এগিয়ে চললেন। নবাবের ছাউনীতে একটা মস্ত সোরগোল পড়ে গেল।

নবাব সেই রাত্রিতেই স্ত্রী লুৎফন্নিসা বেগমের হাতধরে রাতের অন্ধকারে রাজধানী মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন, নবাব তাঁর নিজের রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। নবাব যাচ্ছেন এখন পাটনায় ল-সাহেবের কাছে।

পাটনার নায়েব সুবেদার রাজা রাম নারায়ণের আরজিমতে নবাব কয়েক -জন খেদ্‌মদ্‌গার সমেত নৌকায় সওয়ার হয়ে আজিমাবাদ প্রস্থান করেন। পরদিন রাজ মহলের নিকট পৌঁছে সিরাজ ক্ষুধাতে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তাই নদীরধারে নৌকা লাগিয়ে কিছু খাদ্য সংগ্রহের জন্য এক খেদ্‌মদগারকে নৌকা থেকে নামিয়ে দেন। ঐ খেদ্‌মদগার সরাইখানা মত এক ফকীরের দরগায় খাবার আনতে চট্‌পট্ হাজির হয়। সরাই-খানার মালিক ফকীর দানা-শা নবাবের লোককে চিন্‌তে পারেন এবং বুঝতে পারেন নবাব নিকটেই কোথাও আছেন। পলাতক নবাবকে ধরিয়ে দেবার ইচ্ছে ফকীরের প্রবল হয়। কারণ কিছুদিন পূর্ব্বে নবাবের বিচারে ফকীর দানা-শাকে সাজা পেতে হয়েছিল। তাই নবাবের লোককে বসিয়ে রেখে ফকীর সোজা চলে যায় রাজমহলে। নিমেষের মধ্যে এসে পড়েন মীর-দায়ূদ। ইনি মীরজাফরের ভাই। সসৈন্যে এলেন মীরকাশেম। ইনি মীরজাফরের জামাতা। সসৈন্যেই সিরাজকে বন্দী করে ফেললেন। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব সিরাজদ্দৌলাকে ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরিয়ে একটা ছ্যাকড়া গাড়ীতে চড়িয়ে তাঁর নিজের রাজধানীতে বন্দী অবস্থাতে ফিরিয়ে আনা হল। মীরজাফর তখন খেয়ে উঠে ঘুমুতে যাচ্ছেন। এসময় বন্দী সিরাজকে নিয়ে কিই-বা করেন, শেষে তাঁর উপযুক্ত পুত্র মীরনের হাতে বন্দীকে ছেড়ে দিয়ে ঘুমুতে চলে গেলেন। মীরজাফরের পুত্র মীরন বন্দী সিরাজকে মুর্শিদাবাদের জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের এক কুঠরীতে বন্দী করে রাখেন।

পরে মীরনের হুকুমে চট্‌করে নবাবের গায়ে হাত তুলতে কেউ রাজী হলেন না। মহম্মদী বেগ্‌ নামে এক জহলাদ প্রকৃতির লোক সিরাজকে খুন করতে স্বীকার করে। খুন করবেনা কেন? সিরাজের বাবা জৈনুদ্দীন আহম্মদ এই অনাথ মহম্মদীকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছিলেন। সিরাজের মা আমিনা বেগম খুব ঘটা করে এই মহম্মদী বেগের সাদী দিয়ে আনেন। এসব দয়া দাক্ষিণ্যের কৃতজ্ঞতার কাঁটাতো তখন জহলাদটার বুকে খচ্‌ খচ্‌

করছে। আর সে কাঁটা তোলবার এইতো সুযোগ।

নবাব এদের সকলের ভাবগতিক দেখে সিরাজদের পোষ্য মহম্মদীকে দিয়ে মীরজাফরের কাছে অনুরোধ করে পাঠালেন। বললেন, আমি মীরজাফরের কাছে আর কিছুই চাইনা। শুধু বহুদূরে কোন অজানা গ্রামে গিয়ে গোপনে এক সামান্য প্রজার মত বাস করতে পারলে, আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। এই প্রার্থনা যেন মীরজাফরকে ভালভাবে জানান হয়। কিন্তু প্রার্থনা মীরজাফরকে জানিয়ে কিছু হল না। নীচলোক কখনও কি ক্ষমা করতে পারে? সে পারেন একমাত্র জিনি উদারচেতা বীরপুরুষ। তাই সিরাজদ্দৌলা মীরজাফরের মতন মানুষকেও ক্ষমা করতে পেরে ছিলেন।

মীরজাফরের কাছ থেকে ফিরে এসে মহম্মদীবেগ সিরাজকে হাত পা ধুয়ে কলমা পড়বার সময় টুকু পর্য্যন্ত দিলে না। সাধারণ চোর ছ্যাঁচোড়দের মতন ঘা মারতে মারতে পিটিয়ে শেষে সিরাজকে খুন করে ফেললে। বিশাল বাংলার এই দুঃখময় দিন ২রা জুলাই (১৭৫৭)। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস।

সিরাজের মৃত্যুর পর তাঁর রক্তাক্ত মৃত দেহটি নিয়ে সকলকে দেখাবার জন্যে দেশময় ঘোরান হল। অবশেষে সিরাজের মরদেহটি ভাগীরথীর পারে খোসবাগে সমাধিস্থ করাহয়।

কিন্তু এই সব বিশ্বাসঘাতকদের শেষ জীবন কারো আরামে কাটেনি। মীরজাফর কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে সকলের কাছে ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য হয়ে রইলেন। এঁর ছেলে মীরন যিনি নবাবীর লোভে নবাব আলিবর্দ্দির বংশের কাকেও জ্যান্ত রাখেন নি তিনি বজ্রাঘাতে প্রাণ দিলেন। সেনাপতি দুর্লভ রায় ও ইয়ারলতিফ মীরজাফর ও মীরনের হাতে নাস্তানাবুদ্ হলেন। রাজবল্লভ্ ও জগৎ শেঠকে গলায় পাথর বেঁধে মীরকাশেম গঙ্গার জলে ডুবিয়ে মারলেন। আবার মীরকাশেম বকসার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলাতক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেন, ঘটনা চক্রে মহম্মদীবেগকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ান হয়েছে এবং মহারাজ নন্দকুমার রায় শেষ পর্যন্তি ফাঁসি কাঠে ঝুলেছেন, [illegible] ‘[illegible]ত প্রকর ফাঁসির মঞ্চে’ আবার কেহ বলেন.

খিদিরপুর পোলের কাছে ৫ই আগষ্ট ১৭৭৭ সালে। সিরাজকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করার পর মুর্শিদাবাদের লোকেরা 'জাফরাগঞ্জ প্রাসাদ দেউড়ীকে' বলেন 'নিমকহারাম দেউড়ী'। এই নিমকহারাম দেউড়ীতেই মুর্শিদাবাদের শয়তানি ষড়যন্ত্রের নায়ক জনাব মীরজাফর বাস করতেন। এবং সিরাজ হত্যার পরে সিরাজের 'হীরাঝিল প্রাসাদে' গিয়ে ইনি বাস করতে থাকেন। এখন এ প্রাসাদটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

বিদেশী বিশ্বাসঘাতকদেরও পরিনামে কারো ভাল হয়নি। ওয়াটস বিলাতে পালিয়েগিয়ে মনের দুঃখে সেখানেই মারাগেলেন। স্ক্রাফ্‌ট্‌ জাহাজ ডুবিহয়ে মারা গেলেন। স্বয়ং লর্ড ক্লাইভ্‌ নিজের হাতে গলায় ক্ষুর চালিয়ে আত্মহত্যা করলেন। ওয়াটসন কলকাতার জল হাওয়া সহ্য করতে না পেরে পলাশী যুদ্ধের অল্প ক'দিন পরেই সেটজন্স চার্চ ইয়ার্ডেই মাটি নিলেন।

ইতিহাস বলে, বেগম লুৎফন্নিসা ঢাকায় বহুদিন নির্ব্বাসিত থাকার পর মুর্শিদাবাদে এসে খোসবাগের তত্ত্বাবধানের ভার নেন। এই খোসবাগের মধ্যেই লুৎফা নিজের বসবাসের জন্যে একটি ঘর নির্ম্মান করেন ও তাঁর নিজস্ব মাসিক বৃত্তির (১০০০ টাকা) সব টাকাটাই খোসবাগ কবর খানাতেই ব্যয় করতেন। এখানে নিত্য কোরাণ পাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন। লুৎফা যতদিন জীবিত ছিলেন (১৭৮৬) প্রতিদিন সন্ধ্যায় সিরাজের কবরের ওপরে একটি করে বাতি জ্বালিয়ে দিতেন। আর তারই পাশে বসে নীরবে তাঁর অন্তরের প্রার্থনা জানিয়ে আসতেন।

এখানে দেখাযাচ্ছে— আমীর থেকে ফকীর, কি স্বদেশী কি বিদেশী সকলের বিরাগ ভাজন হয়েও সিরাজ তাঁর ভাগ্যহত অভিশপ্ত জীবনে একটা মস্তবড় জিনিষ লাভ করে গিয়েছেন। সেটি এক মহিয়সী নারীর প্রাণভরা একনিষ্ঠ প্রেম, আর তিনিই তাঁর স্ত্রী 'লুৎফন্নিসা বেগম'। নারী চরিত্রের এরূপ নিদর্শন দেখতে পাওয়া ভার। অদ্ভুত এই লুৎফন্নিসার নারী চরিত্র।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

ভারতে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ২৫শে ডিসেম্বর ভারতে যখন জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টি হল, তখন সরকার পক্ষের তৎপরতা বেশী লক্ষ্য করা গেছে। বাংলার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হলেন। কিন্তু 'এই ভারত ন্যাশান্যাল কংগ্রেসের' উদগাতা ও বীজবপন অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করেছেন মিঃ এ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম সাহেব এবং বড়-লাট বাহাদুর লর্ড ডাফরিন। তখনকার ভারতের গ্রাম্য বিপ্লব ও খণ্ড যুদ্ধ দমনের সুবিধা হবে ভেবেই ভারতের বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় নাগরিকদের নিয়ে কংগ্রেসকে তৈরী করা হয়েছিল, বিপ্লব আন্দোলনকারীরা তাদের নেতা হারাবে এই আন্দাজ নিয়েই।

কারণ, ১৮৫৭তে ভারতে যে বিরাট আকারে বিক্ষিপ্ত গণবিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহ হয়, তারই রেশ দেশের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। এছাড়া বরাবর গ্রামীন যুদ্ধ চলছিল।

(১৮৫৮) মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারত ভ্রমনে আসেন। এই সময় তিনি ঘোষণা করলেন যে, 'ভারতবাসীদের ধর্ম্মের ওপর কোন হস্তক্ষেপ করা হবে না। রাজসরকারের দায়িত্ব পূর্ণ পদে জাতি ধর্ম্ম বর্ন নির্ব্বিশেষে সকল যোগ্য ব্যক্তিকেই নিয়োজিত করা হবে'।

মহারানীর এরূপ উদার মতবাদ প্রচারে ভারতবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, বৃটিশ শাসনে তা'হলে আমরা পাব সুবিচার, জাতি ধর্ম্ম নিরপেক্ষতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সুশাসন ও প্রগতি। কিন্তু বৃটিশ শাসনে

ক্রমান্বয়ে ভাল ও মন্দ ব্যবস্থা সমান ভাবে প্রকাশ পেতে লাগল। ভারতে যখন যিনি বড়লাট হয়ে এলেন, তখন তিনি রাজকার্য্য পরিচালনার সঙ্গে দেশের মধ্যে ধর্ম্মের নামে অনেক জঘন্য ধরনের কু-প্রথার উচ্ছেদ করেছেন। 'ঠগী' দমন, চোর ডাকাতদের উৎপাত বন্ধ করেছেন, দেশে দেশে যোগাযোগের জন্যে রাস্তা, রেলপথ, টেলিগ্রাফ, পোষ্ট অফিস শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আইন আদালত সৃষ্টি করে দেশের মধ্যে যেমন শান্তি-শৃঙ্খলার সঙ্গে সকলের নিরাপত্তা এনেছেন, তেমন অন্যদিকে নানাভাবে বিভিন্ন ধরনের করধার্য্য করে, অর্থশোষন সঙ্গে ভারত হতে বহু মূল্যবান ধনরত্ন অপসারন, দেশের শিল্প বাণিজ্য বলপুর্ব্বক অধিগ্রহণ, চাষাদের নিপীড়ন, তাঁত শিল্প ও দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির ভাল যা'কিছু সব আইন করে করায়ত্ব করেছেন। তাই বলতে হয় যে, পূর্ব্ব শাসকদের মধ্যে লর্ড ডাফ্‌রিন হলেন ভারতবর্ষের উদারপন্থী শাসক। লর্ড ডাফ্‌রিন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন (১৮৮৪-১৮৮৮) এঁর বিবিধ উদারনৈতিক কাজের মধ্যে ভারতে 'জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ভারতের বিভিন্ন দেশ হতে ৭২ জন প্রতিনিধি নিয়ে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশান্যাল কংগ্রেসকে' সৃষ্টি করা হয়। এর প্রথম অবিবেশন হয় বোম্বেতে, গোকুল দাস তেজ পাল সংস্কৃত কলেজ হলে। পরের বছরে (১৮৮৬) কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় কলকাতায়। এই অধিবেশনে প্রায় ৫০০ পাঁচশত প্রতিনিধি যোগদান করেন। এরপর থেকে প্রতিবছরে কোন না কোন বড় শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে আসছে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ১৮৭৬ সালে 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি দেশীয় সংস্থা সৃষ্টি করেন এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করে সমগ্র ভারত ব্যাপী এক নতুন জাগরণের আলোড়ন আনেন। এর ফলে বৃটিশ সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা, অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্য মূলক ব্যবহারের

বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদ করার শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি ভারতীয়দের মধ্যে জাগরিত হতে থাকে।

সুরেন্দ্রনাথের 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' ও সরকার প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশান্যাল কংগ্রেসের' উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপন্থার বিশেষ কিছু প্রভেদ না থাকায়, কালে দুইটি প্রতিষ্ঠান মিশে একহয়ে যায়! এতে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশান্যাল কংগ্রেসের' সদস্য সংখ্যা ও জনশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে কর্ম্মশক্তি আরো ব্যাপক হয়।

এই দুই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মহা মিলনের যাঁরা হোতা তাঁরা হলেন, বদরুদ্দিন তায়েবজী, ফিরোজশা মেহেতা, দাদাভাই নৌরজী, আনন্দ মোহন চার্লু, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈকুণ্ঠ বরাট, রহিমতুল্লা, মহম্মদ সিয়ানী, অরবিন্দ ঘোষ, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, রাসবিহারী ঘোষ, মহাদেব দেশাই, ছোটানী মিঞা অনুসুয়াবেন, মুকুন্দ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, সত্যেন্দ্রনাথ সিংহ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি। এই সব নেতৃবৃন্দের একাগ্র চেষ্টা ও প্রচারের কলা কৌশলে বৃটিশ সরকারের শ্রীভাঁওতা এড়িয়ে ভারত কংগ্রেসকে এক বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিনত করা হয়।

(১৮৮৮-১৮৯৪) বড়লাট হয়ে আসেন লর্ড ল্যান্সডাউন। ইনি রাজকার্য্য পরিচালনার সঙ্গে বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ দমন ও ইঙ্গ আফগান সীমান্ত নির্দ্ধারন করে 'ডুরাণ্ড লাইন' স্থাপন করেন।

(১৮৯৫-১৮৯৯) ভারতের বড়লাট এলেন লর্ড এলগিন। ইনি ইঙ্গ রুশ চুক্তির ফলে অক্ষুনদী রুশ সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমানা বলে নির্দ্দিষ্ট করেন। এঁরা দু'জনেই কিন্তু ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কোন বিরুদ্ধাচারণ করেন নি।

ভারত সরকার প্রথম প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস যখন থেকে সরকারী নীতি ও সরকারী কার্য্যকলাপের সমালোচনা করে সরকারী আইনের সংস্কার

দাবী করতে শুরু করেন, তখন থেকেই সরকার কংগ্রেসের প্রতি ক্রমশঃ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হতে থাকেন।

এরপর বড়লাট এলেন লর্ড কার্জ্জন (১৮৯৯—১৯০৫)। ইনি বঙ্গদেশে জাতীয়তা বোধের অধিক বিকাশ ঘটেছে দেখে, স্বৈরাচারী লর্ড কার্জ্জন বাংলাদেশকে দ্বিধাবিভক্ত করে বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তা বোধ চিরতরে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে নানা অজুহাতে 'বঙ্গ-ভঙ্গ' পরিকল্পনার প্রস্তাব করেন। ১৬ই অক্টোবর (১৯০৫) বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত রূপ দেবার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হল।

লর্ড কার্জ্জনের 'বঙ্গ-ভঙ্গ' ঘোষণার কথা শুনে তার প্রতিবাদে দেশময় তুমুল ঝড় উঠল। ৭ই আগষ্ট (১৯০৫) সারা দেশে হরতাল, অরন্ধন, উপবাস, প্রভৃতির দ্বারা ভারতের সর্ব্বত্র জাতীয়তাবাদীদের পক্ষ থেকে অভুতপূর্ব্ব প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। বিলাতী পণ্য দ্রব্য বর্জ্জনের সঙ্গে স্বদেশজাত সামগ্রীর ব্যবহার হতে আরম্ভ হ'ল। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'বন্দেমাতরম' প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীতে গ্রাম ও নগর মুখরিত হল। দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি খ্যাতিমান ব্যারিষ্টার আব্দুল রসুল, ঢাকার নবাব সলিমুল্লার ভ্রাতা খাজা আতাতুল্লা, আব্দুল হালিম গজনভি, মৌলানা আব্দুল গফুর সিদ্ধিকি, লিয়াকাত হোসেন, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, সুবোধ মল্লিক, আনন্দ মোহন বসু, অশ্বিনী কুমার দত্ত, সুন্দরী মোহন দাস, রজনীকান্ত সেন, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, ব্রজ কিশোর রায়চৌধুরী, মুক্তাগাছার সুর্য্যকান্ত আচার্য্য, বিপিন চন্দ্র পাল, আরো সকল দেশনেতা মিলে এক শক্তিশালী স্বদেশী আন্দোলনের দল যেমন গড়ে তুললেন, তেমন বৃটিশ সরকার দমন-নীতি আরো জোরদার করলেন। বৃটিশ যত পুলিশী অত্যাচার বাড়াতে লাগলেন, দেশে ততই বৃটিশ বিরোধী মনোভাব প্রকট হয়ে উঠতে লাগল।

ক্রমে এলেন বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপতরায়, অরবিন্দ ঘোষ,

রাজনারায়ণ, ভূদেব, লালমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, বিচারপতি গুরুদাস ব্যানার্জ্জী, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, ব্রহ্মবান্দবউপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, চিত্তরঞ্জন দাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্র লাল রায় এঁরাও বঙ্গভঙ্গ প্রতিবাদ আন্দোলনে যোগ দিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে 'রাখীবন্ধন' করে স্বদেশী আন্দোলন আরো জোরদার করলেন। দিকে দিকে বিদেশী পণ্য বয়কট ও ৩০শে এপ্রিল (১৯০৬) ভারতে সর্ব্বাত্মক হরতাল পালন করা হল। বাংলার সর্ব্বত্রেই হিন্দু-মুসলমান মিলনের এক নতুন যুগ আরম্ভ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় লর্ড মিণ্টো বড়লাট হয়ে আসেন (১৯০৫-১৯১০) তিনি লক্ষ্য করলেন ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশের সর্ব্বত্র তীব্র জাতীয়তা বোধের সৃষ্টি হয়েছে। লর্ড মিণ্টো তখন তাই মুসলিমদের কংগ্রেস থেকে আলাদা করে রাখবার পন্থা খুঁজতে লাগলেন। হিন্দু-মুসলমান-এর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন যে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে সক্ষম হবে তা' তারা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ধর্ম্মকে অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করে, দু'টি জাতিতে তফাৎ করে রাখার কৌশল করলেন যে, এই দু'টি জাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাব ও স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত করা।

অবশেষে লর্ড কর্জ্জনের 'বঙ্গভঙ্গ' সমর্থক মুসলিমদের নিয়ে গিয়াসুদ্দিন প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিদের উদ্যোগে, তারসঙ্গে ঢাকার শক্তিমান নবাব সলিমুল্লার সহায়তায় ও মুসলমান ধর্ম্ম নায়ক মহামান্য আগাখাঁর সুপারিশ এবং মিণ্টো সাহেবের কারসাজিতে (১৯০৬) ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলিম লীগের পত্তন হয়। ঢাকার পাকসাফ নবাব সলিমুল্লা সাহেব মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি হলেন। লর্ড মিণ্টো সাহেব তাঁর বক্তৃতায় সরাসরি বললেন, 'এই মুসলীম লীগ' হ'ল কংগ্রেস বিরোধী একটি সম্প্রদায়গত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।'

কংগ্রেসকে দমন করার জন্য মিণ্টো সাহেব 'মুসলিম লীগকে' অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে লাগলেন এবং লীগের সবরকম শক্তি বৃদ্ধির

জন্যে সাহায্য করতে লাগলেন। হিন্দু মুসলিমে বিরোধ ঘটিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে লাগলেন। মুসলিম লীগ শুরুতেই বঙ্গচ্ছেদ সমর্থন করলেন। প্রচার করলেন হিন্দুদের সঙ্গে রাজনৈতিক ঐক্য অসম্ভব। দেশের মধ্যে হিন্দু-মুসলিমে দাঙ্গা বাঁধাবার সহজ পথ আবিস্কার করা হল। রাতারাতি হিন্দুর মন্দিরে গরুর মাথা ও মসজিদের মধ্যে শুয়ারের মাথা ফেলে দিয়ে দারুণ ভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধান হল। আমরা তখন এমনই নির্ব্বোধ ছিলুম।

মুসলিম লীগের করাচী অধিবেশন (১৯০৭) ও পরের বৎসরে অমৃতসরের অধিবেশন বিশেষ তাৎপর্য্য পূর্ন। এই দু'টি অধিবেশনে মুসলিম লীগকে ব্রিটিশ রাজভক্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা করেন। ইংলণ্ডে মুসলিম লীগের একটি প্রচার দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হল। এই প্রচার যন্ত্র মারফৎ ব্রিটিশ সরকারের নিকট আশ্বাস ভিক্ষা করা হয় যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের মুসলমান গণ যেন অধিকতর মর্য্যাদা ও গুরুত্ব পায়।

১৮৮৫ হতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাতীয় আন্দোলন দেশের মধ্যে কিছুটা বিশৃঙ্খল ও বিক্ষিপ্ত ভাবেই চলে আসছিল। আলিগড় আন্দোলন নামে আবার একটি কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন ও ঐ সময় শুরু হয়। স্যার সৈয়দ আহম্মদ ছিলেন, এই দলের নেতা এবং ইনি ছিলেন কংগ্রেসের ঘোর বিরোধী।

১৮৯২ সালে ব্রিটিশ সরকার যে কাউন্সিল এ্যাক্ট পাস করলেন, তাতে প্রতিনিধি মূলক গণতন্ত্র স্থাপনের কোন ইচ্ছা দেখা যায়নি। এই কারণেই কংগ্রেসের কিছু চরম পন্থী সভ্য বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখর নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে অপর একটি দল গঠিত হল এবং ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় এই দলের শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯০৭ সালে কংগ্রেসের চরমপন্থী দল ও নরমপন্থী দলের মধ্যে প্রকাশ্য ভাবেই বিভেদের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময় হতেই বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী গোপন দল চারিদিকে মাথা চাড়া দিয়ে

উঠতে থাকে ও লর্ড মিণ্টোর তদানিন্তন উদার পন্থি সেক্রেটারি অব ষ্টেট/ লর্ড মোরলের সঙ্গে একমত হয়ে আইনের আরো একটু সংস্কার করলেন। এই সংস্কারের ফলে গভর্নর জেনারেলের কার্য নির্ব্বাহক সভায় (Executive Council-এ) দুই জন ভারতীয় কে স্থান দেওয়া হোল (১৯০৭)।

কালে মুসলিম লীগের উদ্যোগে ও আগাখাঁর সুপারিশেই (১৯০৯) ভারত সরকার ভারতের শাসন তন্ত্রের আরো কিছু সংস্কার করলেন। এই সংস্কার বলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন পরিষদে ভারতীয়দের নিয়োগ নীতি সর্ব্ব প্রথম প্রবর্ত্তিত হল। দ্বিতীয় লর্ড হার্ডিঞ্জ বড়লাট হয়ে এলেন (১৯১০-১৯১৫)। লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন এখানে এসে দেখলেন 'বঙ্গ ভঙ্গ' প্রস্তাবের বিরোধীতা, বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন বেশ জোরদার হয়েছে। এর ওপর শাসন পরিষদের ভারতীয় নেতৃন্দের চাপ সৃষ্টি ও গুপ্ত বিপ্লবীদের তাড়না বাড়ছে। এ সবের শান্তি প্রতিষ্ঠায় লর্ড হার্ডিঞ্জ 'বঙ্গ-ভঙ্গ' প্রস্তাব রদ করবেন স্থির করেন।

(১৯১১) ডিসেম্বর মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ভারতবর্ষ পরিভ্রমনে এলেন। দিল্লীতে এক বিরাট দরবার অনুষ্ঠিত হল। এই দরবারের কাজ চলতে চলতে এক সময় সম্রাট নিজেই ঘোষণা করলেন, 'কার্জ্জনের অপকীর্ত্তি 'বঙ্গ-ভঙ্গ' প্রস্তাব আজ হতে রহিত করা হল'। কিন্তু পঞ্চম জর্জ্জের এরূপ ঘোষণা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সম্পূর্ণ পূর্ব্বাবস্থা ফিরে পেল না। আসাম পৃথক হল, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গড়ে উঠল।

১৯১৪ সালে বিশ্বব্যাপী সমরানল জ্বলে উঠল। এই প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। যুদ্ধের সময় বৃটেনকে সাহায্য দানের উৎসাহ কংগ্রেসের এত বেড়ে উঠল যে, গান্ধীজীও তখন ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহের কাজে সহযোগিতা করছিলেন। এতে অবশ্য অনেক কংগ্রেসের লোককে যুদ্ধের কাজে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের শুরুতেই ব্রিটিশের ব্যবহারে ভারত বাসী ক্রমশঃ হতাশায় আচ্ছন্ন হলেন। ঠিক

এই সময়েই তিলক স্বদেশে ফিরে এলেন নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করে। বালগঙ্গাধর তিলক অদম্য উৎসাহে পুনরায় রাজনীতিতে যোগ দিতে চাইলেন। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের দরজা এইসব চরমপন্থী নেতাদের জন্যে উন্মুক্ত রইল না। এই কারণে তিলক নতুন রাজনৈতিক সংগঠনে মনোযোগী হলেন।

শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত ও তিলক অ্যায়ারল্যণ্ড বাসীদের অনুকরণে পূর্ণ স্বরাজ আন্দোলন বা হোমরুল আন্দোলন করতে মনস্থ করেন। তাঁরা পৃথক পৃথক ভাবে 'হোমরুল লীগ' স্থাপন করে স্বায়ত্ত শাসনের জন্যে এক শক্তিশালী আন্দোলনের সূচনা করেন। (১৯১৬) সালে অ্যানি বেসান্ত মাদ্রাজে ও তিলক মহারাষ্ট্রে 'হোমরুল লীগ' গঠন করেন। এই দুই সংগঠনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

বেসান্তের হোমরুল লীগের কার্যপরিধি ছিল বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার বাদ দিয়ে সমগ্র ভারত এবং তিলকের হোমরুল লীগের কর্ম্ম তৎপরতা বোম্বাই' মধ্যপ্রদেশ, বেরারে আবদ্ধছিল। অ্যানিবেসান্ত ও তিলক 'হোমরুল' বলতে দেশের নিজস্ব সরকার বুঝতেন। দেশের প্রতিটি জনসাধারন ভোটের মাধ্যমে আইন সভার সদস্যদের নির্বাচিত করবেন এবং তাঁদের মধ্য হতেই সরকার গঠন করা হবে। এই সরকার আইন সভার নিকট নিজ কার্য্যাবলীর জন্য দায়ী থাকবেন। সংক্ষেপে বলতে হয় ভারতে পরিষদীয় গণতন্ত্র স্থাপন করাই 'হোমরুল' আন্দোলনের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

এঁদের এইসব কাজ দেখে ইংরাজ সরকারের রোষবহ্নি তিলক ও বেসান্তের ওপর গিয়ে পড়ল। হোমরুল দাবীতে অ্যানিবেসান্ত ও তিলককে নানারূপ নির্য্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু তাতেও হোমরুল আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়নি। বরং সরকারের অতিদমন নীতির ফলে এই আন্দোলন দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় প্রতিষ্ঠানই হোমরুল আন্দোলন সমর্থন করলেন। এই হোমরুল আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি মূল্যবান অধ্যায়। এই

আন্দোলনে ভারতে সর্বপ্রথম স্বরাজ সম্বন্ধে একটি বাস্তব পরিকল্পনা জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। এটি মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তিত চেতনার একটি মহড়া বলা যেতে পারে।

এসময়ে লর্ড চেমস্‌ফোর্ড ভারতে বড়লাট হয়ে এলেন (১৯১৬-১৯২১)। ১৯১৬ সালেই এক নতুন ঘটনা ঘটল। বাল গঙ্গাধর তিলক ও অ্যানি-বেসান্ত এঁদের যুগ্ম চেষ্টায় লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন একই সময়ে আহ্বান করা হল। এই দুই দলের অধিবেশন চলাকালে উভয় দলের অধিকাংশ সদস্যরা দেশের কাজে দু'দলের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজন আছে বলে অনুভব করলেন। এমন সময় মহম্মদ আলি জিন্না হিন্দু ও মুসলিম দলের ঐক্যের আদর্শ অনুকরণ করে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। এই ভাষণের বলে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে রাজী হয়ে যান। এবং উভয় দলের শক্তিমান নেতাদের সম্মতি স্বাক্ষর ক্রমে 'লক্ষ্ণৌচুক্তি' সম্পাদিত হয়। দেশের লোকের এ ধরণের কার্য্যকলাপ ও এক জোটের ভাবগতিক দেখে বড়লাট চেমস্‌ফোর্ড (১৯১৭) ঘোষণা করলেন ভারতীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা হবে। এবং এইসঙ্গে ভারতকে গণতান্ত্রিক করে গড়ে তোলা হবে। তখন কিন্তু দেশের লোক পূর্ণ স্বরাজ পাবার চিন্তা করছেন।

লর্ড কার্জ্জনের 'বঙ্গভঙ্গ' ঘোষণার বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন হবার আগে এক মারাঠি যুবক বাংলা ভাষায় একটি বই লেখেন। সেই বইটিতে লেখা থাকে 'স্বরাজ' আমাদের জন্মগত অধিকার'। এই 'স্বরাজ' কথাটি যিনি সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার করেন তিনি হলেন সখারাম গণেশ দেওশঙ্কর। এর পর হতে স্বরাজ কথাটা সারা ভারতবর্ষে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

১৯১৭ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে সভাপতি হলেন অ্যানিবেসান্ত। উক্ত সভায় অ্যানিবেসান্তের

নেতৃত্বে কংগ্রেস 'পূর্ণ স্বরাজের' দাবী জানায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪) ভারতবাসীরা বৃটিশ সরকারকে সকল বিষয়ে যথাসম্ভব সাহায্য দান করেন। এর প্রতিদানে ভারতবাসীদের আশা ছিল যে, যুদ্ধ অবসানে সরকার অবশ্যই শাসন-তন্ত্রের বিশেষ সংস্কার সাধন করে ভারতবাসীদের কিছু সুবিধা দান করবেন। (১৯১৮) ১১ই নভেম্বর ব্রিটিশ-জার্মানীর বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল। যুদ্ধ অবসানে বৃটিশ সরকার ভারতকে কোন কিছু সুবিধা দানের পরিবর্ত্তে (১৯১৯) এক কঠোর দমন নীতিমূলক 'রাউল্যাট আইন' পাশ করবেন স্থির করেন। এই আইনবলে ভারতে হবে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, যথেচ্ছভাবে দণ্ডদান ও দেশবাসীকে দেশ হতে অবাধ নির্ব্বাসন। এই রাউল্যাট আইন পাশ হবার কথা শুনে দেশের লোক মনে মনে খুব বিব্রত হলেন।

এই রাউল্যাট আইন দলিল বড়লাট কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবার পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী এর বিরুদ্ধে সবিনয় প্রতিবাদপত্র লিখে বড়লাটের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু লর্ড চেমস্‌ফোর্ড গান্ধীজীর এ অনুরোধ সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করলেন। তাই গান্ধীজী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মনে এ আইনের বিরুদ্ধে সকল দেশবাসীকে 'সত্যাগ্রহ সংগ্রাম' করার আহ্বান জানান। 'সত্যাগ্রহ' অর্থে শান্ত ও নিরস্ত্রভাবে সত্যের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে নিরস্ত্র ভারতবাসীদের মহাত্মা গান্ধী সংগ্রামের এক নতুন শক্তির পথ দেখালেন।

গান্ধীজীর এই 'সত্যাগ্রহ আন্দোলন'কে স্বাগত জানালেন মদনমোহন মালব্য প্রমুখ কংগ্রেসের মহান নেতারা। রাউল্যাট আইনের প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে গণবিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা হতে লাগল। ব্রিটিশ সরকার এ বিষয়েও পুলিশীদমন নীতির আশ্রয় নিলেন। চারিদিকে ধরপাকড়, মারধোর, গণহত্যা শুরু হয়ে গেল।

১৩ই এপ্রিল (১৯১৯) অমৃতসরের জালিয়ান ওয়ালাবাগে জনগণের

এক প্রতিবাদ সভায় সমবেত নিরস্ত্র জনতার ওপর জেনারেল ডায়ার সাহেবের নির্দ্দেশে জালিয়ান ওয়ালাবাগের সরু প্রবেশপথ রুদ্ধ করে মুহুর্মুহু গুলি বর্ষণে ভারতের প্রায় চারিশত নরনারী প্রাণ হারালেন ও অসংখ্য মানুষ আহত হলেন। এইভাবে ব্রিটিশের দমন নীতি বর্ব্বরতার চরম সীমায় পৌছিল। এই অমানুষিক নৃশংসতার দরুণ ভারতে ব্রিটিশ বিরোধের মনোভাব আরো তীব্র হয়ে উঠল। জালিওয়ালাবাগ কবরখানায় পরিণত হওয়ায় দেশনেতারা এর তদন্ত প্রার্থনা করলেন। কিন্তু এ আবেদন সরকার সম্পুর্ণভাবে অগ্রাহ্য করলেন। এতকিছু ঘটনা ঘটাতেও সরকার 'রাউল্যাট আইন' দেশের মধ্যে বলবৎ করবেন স্থির করলেন। এই 'রাউল্যাট আইনে'র প্রতিবাদে গান্ধীজী তাঁর 'কাইজার-ই-হিন্দ' খেতাব পরিত্যাগ করলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করলেন। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের পদ পরিত্যাগ করে একসঙ্গে বেরিয়ে এলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, পণ্ডিত বিষ্ণুদত্ত ও মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না।

(১৯৩৬) লণ্ডনে এক ঘটনা ঘটল। প্রকাশ্য দিবালোকে সর্ব্বোচ্চ মিলিটারী সৈন্য পরিবেষ্ঠিত সবার চোখের সামনে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের নায়ক কুখ্যাত জেনারেল ডায়ারকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে মারণ অস্ত্রে রক্ততর্পণ করে সুদে আসলে প্রতিশোধ নিলেন ভারতেরই নির্ভীক বীর উদম সিং। এই অদ্ভুত প্রতিশোধের কাণ্ড দেখে বৃটিশ কর্ত্তারা একেবারে হতবাক।

তৃতীয় পর্ব্ব

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ও কমিউনিষ্ট পার্টি।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বিহারে চম্পারণ জেলায় চাষীদের নীলকরের বিরুদ্ধে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে জয়যুক্ত হন। ভারতে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের পথিকৃৎ হলেন গান্ধীজী। এই কারণে কৃষক ও শ্রমিকেরা গান্ধীজীকে তাঁদের আপনজন বলেই মনে করতেন এবং একমাত্র গান্ধীজীর আহ্বানে দেশের সকল আন্দোলনে কৃষক ও শ্রমিকপার্টি উভয়েই যোষদান করতেন। বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম শ্রেণীর যোগ্য কর্ম্মী ছিলেন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও প্রভাবতী দাশগুপ্তা। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বারদৌলীর কৃষকদের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে সরকারের যাবতীয় খাজনা বন্ধ করে দেন।

গান্ধীজী আমেদাবাদে 'মজদুর মহাজন' নাম দিয়ে এক সমিতি গড়ে তোলেন। এতে দেশের নেতারা বুঝতে পারলেন, প্রতি কল ও কারখানায় যে ছোট ছোট মজুর সভা আছে, তাদের যদি একত্র করে একটা বড় সভায় না জড়ো করা যায়, তা'হলে মজুরদের দাবি-দাওয়া আদায় করা শক্ত হবে। এমনি বড় মজুর সভা অনেক সভ্য দেশে আছে। তার নাম 'ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস'। ছোট ছোট মজুর সভাগুলো নিয়ে এইরকম 'ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস' তৈরী হল। সেখানে মজুরদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে তাঁরা সব ঠিক করেন, তাঁদের ভালর জন্য কি করতে হবে। কোথাও ধর্ম্মঘট হলে, সে ধর্ম্মঘট লাগাতা করার জন্য এই মজুরদল তা' চালাবেন।

আমাদের দেশে ১৯২০ সালে এমনি একটি 'নিখিল ভারত ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস' গড়ে উঠল। এর প্রথম অধিবেশন হয় বোম্বেতে (১৯২০, ৩০শে অক্টোবর)। এর সভাপতি হন পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়। তারপর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, পণ্ডিত জহরলাল এঁরাও সভাপতি হয়েছিলেন।

১৯২০ সালে ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়। অধিবেশনের সভাপতি হন বিজয় রাঘব আচার্য্য। এই অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে প্রায় চৌদ্দ হাজার প্রতিনিধি সভায় যোগদান করেন।

নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (Nonviolence & Non Co-operation Movement) করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে, কংগ্রেসের এ প্রস্তাবকে সমর্থন জানাতে পাশে এসে দাঁড়ালেন 'খিলাফৎ কমিটির' আলি ভ্রাতৃদ্বয় মহানেতা সৌকত আলি ও মৌলানা মোহম্মদ আলি। আরো এসে দাঁড়ালেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ মহানেতারা। দেশময় তুমুল আন্দোলনের স্রোত বইতে লাগল। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ হোল নিরস্ত্র প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। পৃথিবীর মধ্যে এ ধরণের সংগ্রাম এই প্রথম আরম্ভ হল।

সংগ্রামের শুরুতেই আরম্ভ হল সরকার প্রদত্ত খেতাব বর্জ্জন, স্কুল ও কলেজ বর্জ্জন, আদালত, কাছারী বর্জ্জন, করদেয়া বর্জ্জন; ছাত্র-ছাত্রীরা দল বেঁধে দিকে দিকে পিকেটিং করতে আরম্ভ করে দিল। উকিল ব্যারিষ্টার এঁরাও পিকেটিংয়ে যোগ দিলেন। সভা সমূহের নির্ব্বাচন বয়কট করা হল। বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী দ্রব্যাদি পোড়ানো আরম্ভ হল, দেশী কাপড়ের চাহিদা মেটাতে ছেলে বুড়ো সকলেই 'টেকোতে' সুতা কাটতে আরম্ভ করলেন। তাঁতীদের ঘরে ঘরে নতুন করে তাঁত বসানো হল, চরকা চলল, দেশী কাপড়ের কলও বসানো হলো। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।

লর্ড রিডিং ভারতে বড়লাট হয়ে এলেন (১৯২১-২৬) ; ভারতের ভাবগতিক দেখে 'রাউল্যাট আইন' নাকচ করলেন। সমর বিভাগে ভারতীয় দিগকে অফিসার পদে উন্নীত হবার অধিকার দান করলেন। আবার অপর দিকে সরকার সত্যাগ্রহীদের দলে দলে গ্রেপ্তার করে ভারতের সব জেলখানা ভরিয়ে ফেলেন। তৎসত্ত্বেও সত্যাগ্রহ আন্দোলনকারীদের পূর্ণোদ্যমে আন্দোলন চলতে দেখে লর্ড রিডিং গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা মাধ্যমে একটি চুক্তি করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গান্ধীজী এ প্রস্তাব নানা ছলে উপেক্ষা করেন।

ওদিকে সত্যাগ্রহীদের ওপর পুরোদমে পুলিশী অত্যাচার চলার সঙ্গে অতিরিক্ত ভাবে প্রাণঘাতী উৎপীড়ন বাড়তে দেখে. ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯২২) উত্তেজিত একদল কৃষক শ্রমিকের জনতা উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার 'চৌরিচৌরা' থানা আক্রমন করে বাইশ জন পুলিশকে হত্যা করে। গান্ধীজী একথা শোনা মাত্রেই বিরক্ত হয়ে বললেন, সত্যাগ্রহে হিংসার কোন স্থান নেই। একথা বলার সঙ্গে তিনি কংগ্রেস মিটিং ডাকিয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিদ রাখলেন। তৎসত্ত্বেও সরকার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করলেন ১০ই মার্চ্চ (১৯২২)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু, বোম্বাইয়ের বিঠলভাই প্যাটেল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মিলে (১৯২৩) 'স্বরাজ্য দল' গঠন করলেন। দেশের নতুন কর্ম্মপন্থা স্থির করাহল। নির্ব্বাচন বর্জ্জনের নীতি বদল করে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় প্রবেশের জন্য ভারতীয় প্রতিনিধিরা নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করবেন স্থির হোল এবং নির্ব্বাচনে দাঁড়িয়ে সরকারের বিরোধী দল হিসাবে আইন সভায় কাজ করবেন এও ঠিক হোলো। অবশেষে সকল বিষয়ে কার্য্যত হোলোও তাই। পরে গান্ধীজী জেল থেকে বেরিয়ে এসে স্বরাজ্য দলকে কংগ্রেসের একটি অঙ্গবলে স্বীকার করে নেন।

১৯২০ সালেই ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির ভিত্তি প্রথমে স্থাপিত হয় বিদেশেই। এ কাজের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বিপ্লবী মানবেন্দ্র

নাথ রায়। ইনি দেশ-ত্যাগ করার পরে ইভ্‌লিন কেণ্ট নামক একজন উচ্চ শিক্ষিতা মহিলাকে রেজিষ্ট্রি বিবাহ করেছিলেন। অনেকের তাই ধারণা যে, মানবেন্দ্র রায় ইভ্‌লিনের প্রভাবেই নাকি সোস্যালিষ্ট-চিন্তা মাথায় নেন ও এই কাজেই ঝোঁকেন।

এদিকে কমরেড্ জনাব মুজফ্‌ফর আহম্মদ ছিলেন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির আন্দোলনের অন্যতম মুখ্য প্রতিষ্ঠাতা। এক কথায় বলতে হয়, ইনি ছিলেন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের একজন প্রথম সারির নির্ভীক বীর যোদ্ধা। ১৯২০ সালের মে মাসে 'নবযুগ' নামে যে সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা বার হয়, সে পত্রিকার মালিক যদিও ছিলেন জনাব এ, কে, ফজ্‌লুল হক্; কিন্তু নবযুগ পত্রিকার পূর্ন কর্তৃত্ব ও সকল দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল মুজফ্‌ফর আহম্মদের ওপরেই।

১৯২৫ সালে 'যুগান্তর' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত দীর্ঘদিন পরে দেশে ফিরে এলেন। ইনি দেখেছিলেন 'য়ুরপের যুব-আন্দোলন'। সেই আদর্শেই তিনি বাংলার যুব শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এঁর সঙ্গে সোৎসাহে এসে যোগ দিলেন ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, সহিদ সুরাবর্দ্দি, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন, দেশ গৌরব সুভাষ চন্দ্র, জহর ভগ্নী কৃষ্ণা নেহেরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

১৯২৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর চকন্ লাল ওরফে সত্যভক্ত ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি (The Indian Communist Party) গঠিত হবার কথা ঘোষণা করেন। ১২ই অক্টোবর তিনিইপ্রথম ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির কন্‌ফারেন্সের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন।

এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য সত্যভক্ত মজফ্‌ফর আহম্মদকে আল মোড়ায় পত্র দেন ও রাহা খরচের জন্য তিরিশ টাকা পাঠান। এই কন্‌ফারেন্সে যথাক্রমে যোগদান করেন জনাব মুজফ্‌ফর আহম্মদ, সচ্চিদানন্দ বিষ্ণু ঘাটে, কেশব নীলকণ্ঠ জোগলে কর, রঘুনাথ শিবরাম, শ্যামসুন্দীন হাসান (লাহোর) জানকী প্রসাদ বাগের হাটা, (বিকানীর) অযোধ্যা

প্রসাদ (ঝাঁসী) সি, কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার (মান্দ্রাজ) ফজলুল হাসান ওরফে হজরত মোহানী, মায়নাপুরম সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার, অর্জ্জুন লাল শেঠী (আজমীর) কুমারানন্দ (বিত্তয়ার রাজস্থান) রাধামোহন গোকুলজী (কলকাতা) প্রভৃতি আরো বহু বিশিষ্ট কর্ম্মী ও সেইসঙ্গে বহু কৃষক শ্রমিক সবাই যোগদান করেন। এই কনফারেন্স নাকি কানপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে যখন কলকতায় বেশ দীর্ঘ দিন ধরে হিন্দু -মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলতে থাকে। তখন 'গণবানী' পত্রিকার পাতায় জনার মুজফ্ফর আহম্মদ অসাম্প্রদায়িক উদার মন নিয়ে জোরাল ভাষায় কলম ধরে, দাঙ্গার বিষময় ফল, অনিষ্টকর চরিত্র লেখেন ও এর প্রতিকারের উপায় ব্যাখ্যা করে বুঝান।

১৯২৭ সালে কাশীপুর (কলকাতায়) অঞ্চলের জুট প্রেস মজুরদের এক সভায় গোড্ বোলে নামক মহারাষ্ট্রীয় এক যুবকের উদ্যোগে (সওদা গারী অফিসের কর্ম্মচারী) কাস্তে ও হাতুড়ী বাদ দিয়ে প্রথম লাল ঝাণ্ডা উঠান হয়।

জনাব মুজফফর আহম্মদ ছিলেন আমরণ সংগ্রামী। তাঁর তৈরী করা কমিউনিষ্ট পার্টির বিস্তৃত ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন স্নেহময়- ও শ্রদ্ধা ভাজন কাকাবাবু এবং ইনিই মেহনতী জনগণের অকৃত্রিম বন্ধু, ভারতের শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের সংগঠক ও সর্ব্বহারাদের মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম পথিকৃৎ।

এ'র সহকর্ম্মী ছিলেন রামমূর্ত্তি, রণদিভে, সুন্দরায়া, এস, এ, ডাঙ্গে, পি, সি, যোশী, ভূপেশ গুপ্ত, রাজেশ্বর রাও তাঁদের সঙ্গে আরও যাঁরা দেশ সেবায় আত্ম নিয়োগ করেছেন তাঁরা হ'লেন প্রমোদ দাশগুপ্ত, মূখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, হীরেন মুখার্জী, নাম্বুদ্রি পাদ, বিশ্বনাথ মুখার্জী, গীতা মুখার্জী হরেকৃষ্ণ কোঙার, রেনু চক্রবর্ত্তী, ইন্দ্রজিত গুপ্ত, প্রমুখ।

এ ছাড়া দেশের অন্যান্য প্রখ্যাত রাজনৈতিক দলগুলিওথেভিন্ন ভিন্ন

ভাবে দেশের নানাবিধ কল্যাণ সাধন করে চলেছেন, একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না।

কমরেড্ মুজফ্ফর আহম্মদ (১৯৩৬) এক সময়ে এলাহাবাদে আসেন এবং ইনি স্বরাজ ভবনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অফিসে ওঠেন। মহম্মদ আশরফ্ রুদ্র, দত্ত ভরদ্বাজ (পলিট্ ব্যুরোর সদস্য) প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর দপ্তরে তাঁর সম্মানে পার্টি দেওয়া হয়। হাইকোর্টের মুজফ্ফর আহম্মদের অন্যতমা এ্যাড্ভোকেট শ্যাম কুমারী নেহেরুও তাঁকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রন করে আপ্যায়িত করেন। গুজব আছে, একসময় কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি বিরোধী দলের বিশেষ চাপ্ সৃষ্টি হলে উক্ত পার্টিকে সামাল দিতে গান্ধীজী বুঝি বলেছিলেন 'আমিই একজন কমিউনিষ্ট'।

লর্ড আরউইন ভারতে বড়লাট হয়ে এলেন (১৯২৬-১৯৩১)। ভারত নেতারা ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলকে দিল্লীতে সমবেত করে (১৯২৮) ভারতের ভবিষ্যত স্বায়ত্ত্ব শাসনের খসড়া বৃটিশ ডোমিনিয়নের অনুকরণে প্রস্তুত করলেন। এই খসড়াটি 'নেহেরু রিপোর্ট' নামে খ্যাত হয়। ১৯২৮ ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে 'নেহেরু রিপোর্টটি' পেশ করা হলে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। জহরলাল নেহেরু ও সুভাষ চন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ লীগ থেকে পূর্ন স্বাধীনতার দাবী উঠলে বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে, গান্ধীজী মধ্যস্থ হয়ে বললেন, 'কংগ্রেসের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা হলেও ইংরাজের নিকট হতে ভারত বর্ষ য়দি সায়ত্ত্ব শাসনের অধিকার পায় তবে তা' গ্রহণ করা হবে। গান্ধীজী আরো বললেন; বৃটিশ সরকার যদি এক বৎসরের মধ্যে নেহেরু কমিটি রচিত স্বায়ত্ত্ব শাসন তন্ত্র অনুমোদন না করেন, তবে পূর্ন স্বাধীনতার দাবীতে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হবে। গান্ধীজীর এ প্রস্তাবটি সভায় গৃহীত হয়।

বড়লাট আরউইন লণ্ডনে গোল টেবিলের আহ্বান জানিয়ে দিল্লীতে

একটি নেতৃ সম্মেলনের আহ্বান করলেন। গান্ধীজী এ সম্মেলনে যোগ দিয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কয়েকটি সর্ত্ত বড়লাটের নিকট পেশ করেন। কিন্তু বড়লাট কংগ্রেসের এই সর্ত্ত গুলি সরাসরি অগ্রাহ্য করলেন। ফলে, গান্ধীজী শূন্য হাতে ফিরে এলেন, এবং ঘোষণা করলেন যে, এইবার তাঁর লক্ষ্য হবে 'পূর্ন স্বাধীনতা'।

(১৯২৯) কংগ্রেসের অধিবেশন বসে লাহোরে। সভাপতি হলেন জহরলাল নেহেরু। অধিবেশনে ঠিকহল যে, যেহেতু বৃটিশ সরকার তাঁদের প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়েছেন অতঃপর ভারতের পূর্ন স্বাধীনতা অর্জ্জনই হবে কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য। স্বাধীনতা অর্জ্জন আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভা গুলি হতে কংগ্রেস সদস্যদের অবিলম্বে পদত্যাগের নির্দ্দেশ দেয়াহয়। এবং ৩১শে ডিসেম্বর মধ্য রাত্রে ইরাবতী নদীর তীরে স্বাধীন ভারতের প্রতীক রূপে ত্রিবর্ন রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করলেন জহরলাল নেহেরু। ঘোষণা করাহল যে, প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস পালন করাহবে। উপস্থিত সকলে উল্লসিত হলেন। কংগ্রেসী শিবিরে, জন সাধারণের মধ্যে, এমনকি লাহোরের অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলিম ঘরে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গেল। লাহোর অধিবেশন শেষে কংগ্রেস সদস্যগণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা আরো দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করলেন।

২৬শে জানুয়ারী (১৯৩০) ভারতের সর্ব্বত্র স্বাধীনতা দিবসে বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে পতাকা উত্তোলন উদ্‌যাপিত হল। লক্ষ-লক্ষ মানুষ ভারতের নগরে পল্লীতে পতাকা উত্তোলন করে সকলে 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করলেন। গান্ধীজী প্রমুখ নেতাগণ সকলেই বুঝলেন যে, পূর্ন সংগ্রামের জন্যে এখন দেশ প্রস্তুত।

পরবর্তী কালে (১৯৫০) গণ পরিষদের মাধ্যমে ঘোষিত হয় যে, ২৬শে জানুয়ারী এখন হতে হবে প্রজাতন্ত্র দিবস ও ১৫ই আগষ্ট হবে স্বাধীনতা দিবস।·········গান্ধীজী আগেই বুঝেছিলেন যে, ভারতে গন-

আন্দোলন সৃষ্টি করতে না পারলে স্বরাজ লাভ অসম্ভব। তাঁর নেতৃত্বে স্বরাজ আন্দোলনের জোয়ার সারা ভারত বর্ষে প্রবাহিত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই নিভৃত তম পল্লীতেও তাঁর জয়ধ্বনি শোনা গেল।

এদিকে বৃটিশ পার্লামেণ্টের সাতজন সদস্য নিয়ে একটি কমিশন গঠিত হয়। তার সভাপতি হলেন বিখ্যাত আইনবিদ স্যার জন সাইমন। এই কমিশনে কোন ভারতীয় না থাকায় শ্বেতাঙ্গ সদস্য বিশিষ্ট কমিশনটি ভারতীয়দের কাছে স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। তবুও (১৯৩০) জুন মাসে সাইমন কমিশন ভারতে এলেন। সকল রাজনৈতিক দল এমন কি মুসলিম লীগের মিঃ জিন্নাসাহেব পর্যন্ত এর তীব্র বিরোধিতা করেন। দিকে দিকে কালো পতাকা তুলে বলা হয় 'গো ব্যাক্ সাইমন'। সাইমন ফিরে যাও ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে।

(১৯৩০) ২রা মার্চ্চ গান্ধীজী কংগ্রেসের এগার দফা জাতীয় দাবী সমন্বিত একটি পত্র বড়লাটের কাছে পাঠান। বড়লাট আরউইন এ দাবী গুলিও অগ্রাহ্য করলেন। এর প্রতিবাদে গান্ধীজী পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন করবেন স্থির করলেন। এসময় সরকার লবন কর বসিয়ে ছিলেন। গান্ধীজী তাই প্রথমেই 'লবন আইন' অমান্য করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

(১৯৩০) ১২ই মার্চ্চ গান্ধীজী গুজরাটের সবরমতী আশ্রম হতে ৭৯ উন আশিজন স্ত্রী ও পুরুষ কর্ম্মী নিয়ে ২৪১ মাইল পথযাত্রা শুরু করলেন। দীর্ঘ ২৪ দিন পথযাত্রা পরে ডাণ্ডি নামক স্থানে পৌঁছিলেন পথযাত্রা কালে বহু গ্রাম ও নগরের মানুষ গান্ধীজীকে শ্রদ্ধার্ঘ্যে অভি-নন্দিত করলেন। অনেকে গান্ধীজীর অভিনব পথযাত্রার সাথী হলেন। ডাণ্ডি পৌঁছবার পরের দিন প্রভাতে সকলে সমুদ্রে স্নান করে সমুদ্র কূল হতে একমুঠো লবন সংগ্রহ করে গান্ধীজী সরকারের 'লবন-আইন' অমান্য করলেন। ঐদিন দর্শক রূপে জনসমাবেশ হয়েছিল প্রায় লক্ষাধিক। গান্ধীজীর এই তুচ্ছ কাজে এত জন সমর্থন দেখে সরকার পক্ষতো তাজ্জব।

এদিকে তখন দেশ নেতাদের বয়কটের তোড়-জোড় সব প্রস্তুত। লবন আইন অমান্যের দিন হতে আবার সর্ব্বত্র আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। কর দেয়াবন্ধ, বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন, ব্যাপক ধর্ম্মঘট, কলেজ ও স্কুলবন্ধ, ছেলে মেয়েরা সকলে মিলে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিলো। আন্দোলনের তীব্রতা যখন চারিধারে চল্‌ছে, তখন 'ধরসানা' নামে লবন গোলা দখল করার নির্দ্দেশ দিলে সরকারের নির্দ্দেশে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হয়। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবীন নেতা জনাব আব্বাস তায়েবজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মহিষবাথানে নেতৃত্ব দেন সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নেতৃত্ব দেন জনাব আব্দুল গাফ্‌ফার খাঁন। এসময় সন্ত্রাস্‌বাদী দলও দিকে দিকে সজাগ্‌ হয়ে ওঠে।

১২ই নভেম্বর (১৯৩০) লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক বসে। এই বৈঠকে কংগ্রেস ব্যতীত অন্যান্য দল ও ভিন্ন মতবাদের প্রতিনিধি গণও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের শেষদিনে (১৯।১।৩১) ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ও গোল টেবিল বৈঠকের সভাপতি র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড বললেন, 'সকল দলের সঙ্গে কংগ্রেসের নেতৃ বৃন্দের যোগদান ও সহায়তা ব্যতীত কোন সংবিধান রচনা ভারতে কার্য্যকর হবেনা। সে কারণ গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের সকল নেতৃবৃন্দের যোগদান চাই।' এরূপ ঘোষণার অব্যবহিত পরেই লর্ড আরউইন কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দিলেন। কংগ্রেসের ওপরে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা তুলে নিলেন। গান্ধীজী ও লর্ড আরউইনের মধ্যে আলাপ আলোচনা আরম্ভ হ'ল। সন্ধির সর্ত্ত হ'ল যে, গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিদ রাখবেন, সরকার সকল সত্যাগ্রহীদের মুক্তি দেবেন, সমুদ্রতীরবাসীরা বিনা বাধায় লবন প্রস্তুত করতে পারবেন, এবং কংগ্রেস নেতৃবর্গেরা দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করবেন। এইভাবে যুক্ত বৈঠকে উভয়ের স্বাক্ষর ক্রমে 'গান্ধী আরউইন চুক্তি' সম্পাদিত হল ৫ই মার্চ্চ ১৯৩১।

পরবর্ত্তী কালে ভারতের স্বায়ত্ব শাসন দাবী পত্রে স্বাক্ষর দিলেন তখনকার সর্ব্বভারতীয় সর্ব্বোচ্চ জননেতা মহাত্মাগান্ধী, মতিলাল নেহেরু, মদন মোহন মালব্য, তেজবাহাদুর সাপ্রু ও মুসলিম লীগনেতা মহম্মদ আলি জিন্না।

মুসলিম লীগের এই জিন্না সাহেব কংগ্রেসে থাকাকালীন সদস্যদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, কংগ্রেসের সভ্য বা সদস্য করতে অশিক্ষিত ও অপগণ্ড গুলোকে যেন কংগ্রেস তালিকা ভুক্ত না করা হয়। নইলে কংগ্রেসের শৃঙ্খলা নষ্ট হবে। তাই যাদের নেওয়া হবে তাদের শিক্ষার মান থাকা চাই। কিন্তু তা'করা হয়নি। কেননা, কংগ্রেসের প্রথম কাজ রাজ্যে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। এতে অশিক্ষিত, বেপরোয়া, হঠকারীদের বাদ দিলে কংগ্রেসের জনসংখ্যা কমে যাবে। তা'ছাড়া বলা মাত্রেই সংঘর্ষ বাঁধানো যাবেনা। তাই বলতে হয় যে, সুরম্য প্রসাদ তৈরী শুধু ইঞ্জিনিয়ার আর রাজের দ্বারা তা হবে না, তার সঙ্গে উপযুক্ত যোগানদার চাই। কাজেই সুশিক্ষিত ছেলে-মেয়ে দেশকর্ম্মীদের সঙ্গে আপামর জন সাধারণের মাথায় গান্ধীজীর টুপি ও খদ্দরের কাপড় পরিয়ে তার সঙ্গে 'সত্যাগ্রহের অঙ্গীকার মন্ত্র' পাঠ করিয়ে রাতারাতি প্রচুর সংখ্যায় স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবক বাড়ানো হয়ে ছিল।

চতুর্থ পর্ব্ব

রাসবিহারীর ভারত ত্যাগ ও গান্ধীজীর প্রত্যাবর্ত্তন

জনশ্রুতি মতে বিপ্লবের জনক যদিও মহারাষ্ট্রের বাসুদেব বলোবন্ত ফাদকে, তথাপি বলতে হবে অগ্নিযুগের ইতিহাসে রাসবিহারী বোসের যেন তুলনা হয় না। রাস বিহারী বৈপ্লবিক কর্ম্ম পদ্ধতির দ্বারা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে ভারতকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেন।

১৮৮৬ সালে ২৫শে মে হুগলী জেলায় পালারা বিঘাটি গ্রামে রাসবিহারী বসু জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিনোদ বিহারী বসু ছিলেন ভারত সরকারের কর্ম্মচারী। রাসবিহারী শিক্ষালাভ করেন প্রথমে চন্দন নগরে ও পরে কলকাতায়। চন্দন নগর তখন ফরসীদের অধীন ছিল। এবং পররাষ্ট্র কারণে চন্দননগর ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্য বিরোধী বিপ্লবীদের আশ্রয় স্থল। অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর সঙ্ঘ, গদর পার্টি, আত্মোন্নতি সঙ্ঘ ও অন্যান্য বিপ্লবী সংস্থার বিপ্লবীরা এখানে এসে থাকতেন। রাসবিহারী পনের বছর বয়স থেকেই এই সকল বিপ্লবী দলে মেলামেশা করতেন। এবং এই বয়স থেকেই সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারত থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ উৎখাতের ব্রত গ্রহণ করেন।

বিপ্লবী রাসবিহারী বোস ১৯১২ সালে উৎসব মুখর দিল্লীতে এক যুবককে নিয়ে রূপসীর ছদ্মবেশে তদানিন্তন বড়লাট দ্বিতীয় লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপ করিয়ে ভারতে বৃটিশ প্রভুত্বের ওপর জোরাল আঘাত হানেন। এবং রাসবিহারী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করার যে বিশেষ সংস্থা গড়ে তোলেন, যে সংস্থার কর্মকাণ্ড সুদূর পঞ্চনদ হতে

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শুধু তাই নয়, ব্রহ্ম মিয়ামোতে, সানফ্রান্সিস্কো, বার্লিন, টোকিও, কাবুল পর্য্যন্ত সকল স্থানে এ সংস্থার যোগ সূত্র ছিল।

এঁদের কাজ ছিল শক্তির দ্বারা শক্তিকে প্রতিরোধ করা। সরকারের সন্ত্রাসকে গুপ্ত সন্ত্রাসের মাধ্যমে পাল্টা আঘাত করা। বিপ্লবীদের ক্রমান্বয়ে এসব কাজের ফলে কলকাতার ইংরেজরা গুপ্ত বিপ্লবীদের বেশ ভয় করছিল। তাই ১৯১২ সালে ২৩শে ডিসেম্বর ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হোল।

দিল্লীর রাজধানী নতুন করে পত্তনের সময় ভাইস্রয় লর্ড হার্ডিঞ্জের (১৯১০-১৯১৫) প্রবেশের ব্যাপারটা ছিল বেশ জাঁকালো। একটু লোক দেখানো ভাব ও এতে ছিল। তাই এই রাজকীয় উৎসবে এসেছিলেন বিদেশী দর্শকেরা, দেশীয় রাজা রাজড়ারা, বড় বড় ব্যবসায়ীরা এবং অন্যান্য লোকেরা যারা বিদেশী রাজের সমর্থক তাঁরাও একে একে সবাই এসে জুটেছিলেন দিল্লীতে।

বিপ্লবীরাও বৃটিশের উদ্দেশ্য জানতেন। তাই তাঁরাও এই উপলক্ষ্যে বিদেশী বৃটিশ রাজ শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। বিপ্লবী রাসবিহারী বোস, মাষ্টার আমীর চাঁদ দিল্লীতে নিজেদের লোকজন ও মাল মসলা নিয়ে তৈরী হয়ে বসে ছিলেন। এবং সময় মত বাংলা থেকে বোমাও আমদানি করা হয়েছিল।

পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর পাহারায় ভাইসরয়ের শোভাযাত্রা চাঁদনী চকের ভেতর দিয়ে যাবে, এটা আগেই ঠিক ছিল। চারিদিকে বিশাল জনতা ভীড় করে দাঁড়িয়ে। রাসবিহারী ও তাঁর লোকজন ঠিক ঠিক জায়গায় স্থান গ্রহণ করেছিলেন। রাসবিহারী যে জায়গায় ছিলেন, ঠিক তার উল্টো দিকে ছিল পাঞ্জাব ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ক। ঐ বাড়ীর ছাদে মেয়েরা সব জায়গা করে বসে ছিলেন। রাসবিহারীর এক সঙ্গী যুবক [redacted] বিশ্বাস মেয়েদের ছদ্মবেশে ঐ ছাদেই প্রথম সারিতে এসে বসেন।

মস্ত এক সুসজ্জিত হাতীর পীঠে চড়ে ভাইসরয় ও তাঁর স্ত্রী সোভাযাত্রা করে আসছিলেন। পিছনে পিছনে আসছিলেন যত বিদেশী অতিথি আর দেশী রাজারা। সারা ভারতের গোয়েন্দা বিভাগের দক্ষ লোকেরা চারিদিকে সজাগ ছিল। সকলের দৃষ্টি ছিল ভাইসরয়ের ওপর। সোভাযাত্রা যেই ব্যাঙ্কভবনের নিচে এসে পৌঁছিল, সেই রাসবিহারী সঙ্কেত করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত হাতীর ওপর বোমা ছুঁড়ে মারলে। বিকট শব্দে বোমা ফাটল। ধোঁয়ায় চারিদিক ভরে উঠল। মাহুত মারা গেল ভাইসরয় আহত হলেন। এক নিমিষেই ব্রিটিশ জাঁক-জমক সব মিলিয়ে গেল। গণ্য মান্যদের মুখ পাংশু হয়ে গেল। মাত্র শুধু দিল্লীতেই নয়, সারা ভারতের জনগণ উল্লসিত হয়ে উঠলো। তাঁরা বুঝতে পারলেন ১৯০৮ সালে মজঃফর পুরে ক্ষুদীরামের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। ইংল্যাণ্ড তথা সারা তুনিয়া বুঝলো ভারতের বিপ্লবীরা একটা সত্যিকারের শক্তি। তারা রাজধানী দিল্লীতেও বৃটিশ শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে। পুলিশ এ বোমা নিক্ষেপের কোন সূত্রই খুঁজে পেলনা।

১৯১৩ সালে কলকাতায় রাজাবাজার একটি বোমা তৈরীর কারখানায় খানাতল্লাসী করার সময় দিল্লীর একটি ঠিকানা পাওয়া গেল। এর ফলেই হার্ডিঞ্জ বোমা নিক্ষেপ মামলা শুরু হয়। এতে চারজন বিপ্লবী মাষ্টার আমীর চাঁদ, আউধ বিহারী, বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি হল। প্রথম তিন জনের ফাঁসি হল দিল্লী জেলে আর বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি হল আম্বালা জেলে। অসাবধানী হুজুগে কর্মীদের দায়িত্ব পালনের সামান্য ভুলের মাশুল দিতে হল এতগুলি প্রাণ। কিন্তু নেতা রাসবিহারীকে ধরা সম্ভব হলনা।

আজকের বাংলা যেমন রাসবিহারীকে সম্যক জানেনা তেমন আজকের দিল্লীর লোকেরাও কি জানে যে, মাষ্টার আমীর চাঁদ তাঁদের কে ছিলেন। এঁরা তু'জনেই জন জীবনের সব ঘটনাতেই থাকতেন সকলের

পুরো ভাগে। আমীর চাঁদ সেই সময়ে দিল্লীর সব চেয়ে বড় জননেতা ছিলেন। আমীর চাঁদ ও রাসবিহারী খোস মেজাজে ভারতের যত্র-তত্র ঘুরে বেড়াতেন।

রাসবিহারীর সকল দলে বেশ মেলামেশি ছিল। ইনি অনেক গুলি ভাষায় কথাবার্ত্তা বেশ ভাল বলতে পারতেন। শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদের সঙ্গেও রাসবিহারীর যথেষ্ট পরিচয় ছিল। শ্বেতাঙ্গদের এক সভায় রাসবিহারী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বড়লাট হার্ডিঞ্জের প্রতি বোমা বিক্ষেপ এই গর্হিত কাজের প্রতিবাদ করে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। শ্বেতাঙ্গ দল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন 'Ow whatan angel is Rasbehari' অথচ তখন এই রাসবিহারীরই মাথার দাম সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী ছিল সাড়ে বার হাজার টাকা।

রাসবিহারীর প্রতিটি কর্ম্ম প্রয়াসের মূল উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু, ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচন করা। তাই (১৯১৫) সালে আর একবার সিপাহী বিদ্রোহ ঘটাবার জোড়-জোড় করা হয়। এবারের সিপাহী বিদ্রোহ ঘটানোর বিষয়ে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সকল বিদ্রোহী নেতাদের যথা মানবেন্দ্র, পিংলে, বারীন, অরবিন্দ, শ্যামাজী কৃষ্ণ বর্ম্মা, সর্দ্দারসিং রানা মদনলাল ধিংড়া, রাজামহেন্দ্র প্রতাপ, প্রতাপ চক্রবর্ত্তী, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, বীরেন চাটুয্যে প্রভৃতির যোগ ছিল। কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় ঘটনা ঘটবার আগেই সরকারের কাছে সব ফাঁস হয়ে যায়। তাই ১৯১৫ সালের মে মাসে বৃটিশ রক্ত চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে রাসবিহারী দেশ ত্যাগ করলেন। রাসবিহারীর বয়শ তখন মাত্র উনত্রিশ।

এই বিপ্লবী মহানেতার 'সানুকুমার' জাহাজ যোগে ভারত ত্যাগ একটি রহস্যময় ঘটনা। বিপ্লবী রাসবিহারী বোস তখনকার বিখ্যাত ধুরন্ধর শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা মিষ্টার চার্লস্ টেগার্ড সাবেবের সঙ্গে করমর্দ্দন করে সমস্ত বৃটিশ গোয়েন্দা ও গুপ্তচরদের সুকৌশলে ফাঁকি দিয়ে, রাজা পি, এন, টেগোরের ছদ্মনামে স্বদেশ ত্যাগ করে জাপানে আশ্রয় নেন। জাপানে

কেশরী লালা লাজপতরায় ও হেরম্ব গুপ্ত এঁর একাজের সাক্ষী ছিলেন।

জাপানে অবস্থান কালে এঁর ব্রিটিশ বিরোধী কার্য্যকলাপে সন্দেহ করে বৃটিশ দূতাবাস এঁকে জাপান থেকে বিতাড়িত করবার জন্যে যখন জাপান সরকারের নিকট দাবী জানান, তখন জাপানের সামরিক পুনরুজ্জীবনের উদ্যোক্তা স্বয়ং মিৎসুই তোয়ামা এঁকে আশ্রয় দিয়ে রাখেন। এই মিৎসুই তোয়ামার প্রভাব বিস্তৃত ছিল সম্রাটের প্রাসাদ থেকে কৃষকের কুটির পর্য্যন্ত। রাসবিহারীকে আশ্রয় দেওয়ায় এই লৌহ মানব তোয়ামার সঙ্গে বৃটিশ দূতাবাসের বিবাদ আরম্ভ হয়। জাপান তখন বৃটিশের মিত্ররাষ্ট্র। জীবিত অথবা মৃতঅবস্থায় গ্রেপ্তারের জন্যে হায়নারূপী বৃটিশ গুপ্তচরগণ রাসবিহারীর সন্ধান করতে থাকলে শক্তিধর তোয়ামা এক নতুন ফন্দী আঁটলেন। তখনকার জাপানের সামুরাইদের চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘন করে, সোমা পরিবারের এক জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে রাসবিহারীর বিবাহ ব্যাবস্থা করেন। ১৯২৩ সালে রাসবিহারী বোস জাপানের নাগরিকত্ব লাভ করেন ও ওখানেই বসবাস করতে থাকেন।

রাসবিহারীর স্বদেশ ত্যাগের সন্ধিক্ষণে ১৯১৫ সালের মধ্যেই আফ্রিকা হতে ভারতে ফিরে আসেন সত্যাগ্রহ জয়ী মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের তরফ হতে জাতি বৈষম্যের ও বর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সিদ্ধি লাভ করেন। গান্ধীজী ভারতে এসে পুরোপুরী কংগ্রেসে যোগ দেবার পর থেকেই ভারত কংগ্রেসের দলাদলি নষ্ট হয় ও শৃঙ্খলার সঙ্গে স্বাধীনতার আন্দোলন চলতে থাকে।

প্রকৃত পক্ষে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের এক যুগ সন্ধিক্ষণে গান্ধীজীর আবির্ভাব। এবং তিনি নিজেকে জনগণের দীন সেবক বলেই পরিচয় দিয়েছেন। গান্ধীজী তাঁর কার্য্যারম্ভেই সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে বলেন, তোমরা গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে মিশে তাঁদের নিস্কাম সেবাদাও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা কর, ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দাও। তা'তেই দেখবে যে. আদর্শ গ্রাম গঠন করা হবে।

এই ভাবে গান্ধীজী প্রথম থেকেই পল্লী উন্নয়নের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। যারফলে খেলাফৎ, পাঞ্জাব, স্বরাজ এই তিন দলের মধ্যেই ভারতের হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে এসে দাঁড়াল। হিন্দু-মুসলিম মিলনের শান্তির প্রতীক ত্রিরঙ্গা ঝাণ্ডা ওঠান যথার্থ-ই সার্থক হল।

অবশ্য এসকল স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগতির কাজের মূলে দেশ প্রেমিক কাগজ ওয়ালাদেরও কৃতিত্ব ও সহায়তা অনস্বীকার্য্য। এই সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পণ্ডিত, রামচন্দ্র ভদ্ররাজ, হরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত দ্বারিক নাথ বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণ দাস পাল, কৃষ্ণ কুমায় মিত্র, উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, সুব্রহ্মাণ্য আয়ার, বালগঙ্গাধর তিলক, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ, মাখম লাল সেন, মতিলাল ঘোষ, সুভাষ চন্দ্র বসু, সুরেশ চন্দ্র মজুমদার, জনাব মুজাফ্ফর আহম্মদ, নজরুল ইস্‌লাম সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

বৃটিশ যে, আমাদের তৃতীয় পক্ষ একথাটা দেশের সবাইকে ভাল করে বুঝাবার জন্যে গান্ধীজী বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন ও মাদক সেবন বর্জ্জন আন্দোলন ভারতে শুরু করেন। সুরেন্দ্রনাথ যেমন আন্দোলন করেন **Nov co-operation** (অসহ যোগ আন্দোলন) গান্ধীজী এর সঙ্গে জুড়ে দিলেন **Non Violence** (অহিংসবাদ)।

গান্ধীজীর মাদক দ্রব্য বর্জ্জন আন্দোলনের কারণ হল মধ্য যুগ হতে আমাদের দেশে আবগারী দোকানের খরিদ্দার প্রায় সব ঘরেই ছিল। বিশেষ করে তখনকার ধারণা মতে মদ্যপান করাটা আভিজাত্যের এক বিশেষ অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই এখনকার সিনেমা দর্শকদের মত বিকাল হতেই সকলে আবগারী দোকানের সামনে ভীড় করে দাঁড়াত ও মদ্যপান করাটা সর্ব্ব সাধারণের বিলাসে পরিনত হয়েছিল। এতে করে প্রায় ঘরে, পাড়ায়, ট্রামে, বাসে একটা কিছু মাতলামী কাণ্ড ঘটত, আর সেইটাই হত সকলের আন্দোলনের উৎস।

দেশের এই অন্ধ পরিনতি দেখে গান্ধীজী তাঁর অনুচরদের আবগারী দোকানে পিকেটিং করাতে নির্দ্দেশ দেন এবং এর সাহায্যেই দেশের মধ্যে এক নতুন চেতনার সঞ্চার হয়। শুনতে সহজ কথা যে, ছেলেরা নেশা-খোরদের নেশা করতে দেবেনা। তাই তারা হাতজোড় করে, অনুনয়-বিনয় করে, শেষে পা জড়িয়ে ধরে নেশাখোবদের নেশা করতে বারণ করছে। ব্যাপারটা এদেশে খুবই নতুন। দেশের মধ্যে এই নতুনতর আন্দোলন (পিকেটিং) দেখতে দর্শকদের ভিড় হতখুব। আবগারী ওয়ালারা ও নেশাখোরেরা পিকেটিংয়ে অতিষ্ঠ হয়ে বৃটিশ কর্ত্তাদের জানাতো। শান্তি রক্ষার জন্যে আসতেন ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার। দারুণ প্রহার করে টানতে টানতে থানায় নিয়ে যেতেন ঐসব নিরীহ স্বেচ্ছা-সেবক ছোট ছোট শিশুদের। ফলে দেশময় একটা মস্ত সোরগোল পড়ে যেত, ঘরে ঘরে আলোচনা হতে থাকতো যে, ব্রিটিশ অফিসাররা কি পাজী, এই সব সৎকাজের বিনিময়ে পুলিশ অফিসাররা সরল শিশুদের ওপর কি নিষ্ঠুর প্রহারই না করছে।

টেকো ও চরকা ব্যবহার এবং নুন তৈরী আন্দোলন অতি সাধারণ মানুষকেও বুঝিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের দেশের জল মাটিতে স্বল্প আয়াসে যা’তৈরী করে নেয়াযায় তা’ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাদের করতে দেবেন না। কেউ যদি তা’ করে, তবে তার প্রতি কঠোর সাজার ব্যবস্থা করা হবে। গান্ধীজীর এসব নব নব সহজ আন্দোলন গুলি দেশ বাসীর চোখে যেন আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, বৃটিশ আমাদের কে ?
এইভাবে জন জাগরণের ফলে দিকে দিকে গজিয়ে ওঠে তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেতা আর তাদের গোড়ায় সার জল দিয়ে ফুলে ফলে জীবন্ত করে তোলেন গান্ধীজী। ক্রমান্বয়ে দিন দিন মহাত্মাজীর অনুচয় গেল বেড়ে। বুদ্ধিজীবি বড়বড় লোক যাঁরা সরকারী পরিষদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে গান্ধীজীর মহান উদ্দেশ্য যাঁরা বুঝলেন তাঁদের সকলেই একে একে গোলামী ছেড়ে জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন।

মহাত্মাজীর বেদীর তলে। মহাত্মাজীও সকলকে সাদর আলিঙ্গনে তাঁদের উপাধি দানে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করলেন।

প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী বললেন, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নামই স্বরাজ। হিন্দু-মুসলিমে স্থায়ী আন্তরিক যোগ ছাড়া এদেশের দুর্দ্দশা দূর করবার আর কোন উপায় দেখিনা।

গান্ধীজী এই কঠোর সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এলেন ভারতের জন সমাজের মাঝে। জহরলাল নেহেরু বললেন, গান্ধীজী এলেন যেন গুমোট আবহাওয়ার মধ্যে শীতল বাতাসের মত। বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে বাঁচলাম আমরা। গান্ধীজী এসেছেন তিমির বিদায় উদার অভ্যুদয়ের মত। এ যেন এক নতুন ঘূর্ণী। কতজনের কত লাগন লাগিত মতামত সব গেল উড়ে। গান্ধীজী উর্দ্ধ থেকে অবতরণ না করে, ভারতের জনারন্যের মধ্য থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন। কথা বললেন. জন সাধারণের ভাষায়। তাদের বেদনা গান্ধীজীর বানীতে মুখর হল। নুয়ে পড়া শিরদাঁড়া সোজা হ'ল। উঁচু হল তাদের চিরদিনের নিচু মাথা।

আমাদের দেশে কংগ্রেসের মিটিং হবার সপ্তাহ পূর্ব্ব হতেই চারিদিকে প্রচারের জন্য খবর ছড়ান হোত। শঙ্খধ্বনি, বাজী পোড়া, সঙ্গীত ও যথা সম্ভব অন্যান্য অনুষ্ঠানও করা হোত। বন্দেমাতারম। মহাত্মাজীর জয়, ইনক্লাব জিন্দাবাদ প্রভৃতি স্লোগান চীৎকারের পর চীৎকারে দেয়া হোত। ফলে বহুদূরের পাড়া প্রতিবেশীরা জানতে পারতেন যে, দেশে আজ মিটিং হচ্ছে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। বক্তা যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে প্রচলিত বহু ভাষার পণ্ডিত লোকও অনেক থাকতেন ও বক্তৃতাও দিতেন রকম রকম ভাষায় বহুক্ষণ ধরে।

সুভাষবাবু বক্তৃতা দিতে উঠে, তাঁর মুষ্টিবদ্ধ বাহু উর্দ্ধে তুলে গম্ভীর গলায় বললেন, বৃটিশের চালাকী আমরা ধরে ফেলেছি। ওরা আর বেশীদিন আমাদের ওপর অত্যাচার করতে পারবে না। শাসন ও শোষন সব বন্ধ হয়ে যাবে। বিদেশী জিনিষ বয়কট কর। বিলাতী

জিনিষ কেউ কিনোনা। পাটের চাষ বন্ধ করে দাও। থানার পাশে পাশে কংগ্রেস অফিস্ গড়ে তোল। দিকে দিকে স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী প্রস্তুত কর। জনসাধারণকে বুঝিয়ে দাও যে, ব্রিটিশ আমাদের শত্রু। তাঁদের অন্যায় শাসন আমরা মানব না। ধ্বংস করে দাও যত বিদেশী জিনিষ, এই বলে সুভাষবাবু অগ্নি সংযোগ করলেন কতকগুলি বিলাতী কাপড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সুভাষবাবুর জয় ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে সভা ভঙ্গ হল।

———

নেতাজীর আজাদী সংগ্রাম ও কলকাতায় দাঙ্গা

অভ্যাস বসে চায়ের আসরে সংবাদ পত্রে চোখ বুলিয়ে যাই, কিন্তু লীগনেতা কায়েদে আজম জিন্না সাহেবের এ্যাক্‌টিভিটি বড় একটা চোখে পড়েনা। এবার কিন্তু স্বয়ং জিন্না সাহেব তাঁর দল বল সহ বজ্র মুষ্টিতে ঝাণ্ডা নিয়ে এগিয়ে আসছেন। তাঁর এরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়া অনেকের কাছে নতুন। তাই আমিও লীগের নতুন অভিযানের দিকে দৃষ্টি দিলুম।

লীগের কথা ভাবতে গিয়ে কংগ্রেসকে মনে পড়লো, মনে পড়লো যিনি ভারতের রাষ্ট্রীয় সাধনাকে প্রথম দিকে সমৃদ্ধ করেছেন, সেই বাংলার রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বস্তুতঃ এঁর স্বদেশ সেবা আরম্ভ হয়, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে থেকে। ইনি তখনকার রাষ্ট্র ধুরন্ধরদের কাছে বাঙ্গালীর গৌরব প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইনি কোন আবেদন বা নিবেদন না ক'রে জন শক্তির প্রয়োগ কৌশলে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বাতিল করার চেষ্টা করেন। এইটাই তাঁর তখনকার দিনে রাজনীতির প্রথম পরিচয়।

তাই সুরেন্দ্রনাথের আহ্বানে আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলে এক সঙ্গেই সাড়া দিয়েছিলেন এঁরই এক নায়কত্বে ক্ষুদ্র আকারে স্বায়ত্ব শাসনের প্রথম প্রতিষ্ঠা 'পৌরজনাধিকার কলকাতা করপোরেশন'। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজের ওপর সব ঝুঁকি নিয়ে ইনি অগ্রসর হতে পারতেন বলেই লোকে বলে রাষ্ট্রনায়ক।

নেতা যদিও দুই প্রকার—আদর্শ বাদী ও সুবিধা বাদী। স্থানে ও

কালে কাজের কৌশলের জন্যে উভয় বাদীবই হয়তো প্রয়োজন হয়। তবুও কি অপরাধে বা কারণে জানিনা এই রাষ্ট্রগুরু স্বুরেন্দ্র নাথের বিরুদ্ধেও দেশের জন সাধারণের বিক্ষোভ দেখেছি। ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়কে নিয়ে সুরেন্দ্র নাথের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দিতা করতেও দেখা গেল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সরোজিনী নাইডু, আরো অন্যান্য নেতাদের এক জোটে কি সমারোহ বিরোধিতা। যারফলে বিপুল ভোটে জয়ী হলেন বাংলার অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়। আর পরাজিত রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের নাম করে এক কাষ্ঠ পুত্তলিকা কাঁধে নিয়ে জনগণের কি মর্ম্মঘাতী অপমানকর শোভাযাত্রা। এ মর জগতে সবই সম্ভব।

এদিকে লীগনেতা জিন্নাসাহেবের কি এক পলিটিক্যাল্ ফাইটের নতুন নির্দ্দেশ প্রচার করছেন যে, ডাইরেক্ট এ্যাক্সান দিবস পালন করবেন তাঁরা ১৬ই আগষ্ট শুক্রবার। ভারতের সর্ব্বত্রই এই বাণী প্রচার করা হচ্ছে। মিল, কারখানা, চায়ের দোকান, লাইব্রেরী প্রভৃতি লোক বহুল ও জন বহুল স্থানে সর্ব্ব জাতির মধ্যে আলোচনার খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছে, আসছে এবার ১৬ই আগষ্ট।

অনেকের ধারণা হয়তো দেশে আবার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আরম্ভ হবে, নয়তো হবে হিন্দু-মুসলমানে আবার মিলন। সাধারণের মধ্যে ১৬ই আগষ্টকে কেন্দ্র করে বহু যুক্তিতর্ক চলতে থাকল। লীগের যুব-শক্তির নতুন উৎসাহ ও উদ্যম দিন দিন বাড়তে দেখা গেল। নিরীহ নির্ব্বিবাদী অতি সাধারণ মুসলিম যাঁরা দেশ ও দশের কোন দিনই কোন খোঁজ রাখেন না তাঁরাও এই হিড়িকে পড়ে 'পাকিস্তানের' অর্থটি বুঝলেন। তাই একে একে সকলে নাম লেখালেন লীগে ও লীগের পতাকা তাঁদের প্রতি ঘরেই উড়তে দেখাগেল।

প্রায়ই মাইকের বক্তৃতা কানে আসছে, অতীতে ভারতবর্ষের চাষীরাই কৃষি জমির অধিকারী ছিলেন। রাজন্যবর্গেরা কখনো কৃষিভূমির পুরা রাজস্ব নিতেন না। বরং রাজা দেশে কৃষির উন্নতির জন্যে

প্রয়োজনীয় অর্থ, কৃষিভূমিতে জলসেচ ও গো-চারণ ব্যবস্থা করে দিতেন। এবং সে উৎপন্ন ফসলের একষষ্ঠাংশ রাজা নিতেন। চাষীদের জিনিষ চুরি গেলে বা উদ্ধার করতে অসমর্থ্য হলে রাজা তার ক্ষতিপূরণ দিতেন। এই ভাবে স্মরনাতীত কাল হতে দরিদ্র চাষীদের কৃষি ভূমির ওপর যে সম্মান জনক ভাবে কর্ত্তৃত্বের শর্ত ছিল বৈদেশিক শাসনে আজ তা' বিলুপ্ত।

এইভাবে লীগের তরুণ দল রাজপথে উল্লাস ভরা চীৎকারে শ্লোগান দিয়ে বেড়াতে লাগল। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' লাড়কে লেগা পাকিস্তান আল্লা হো আকবর ধ্বনি তুলে পল্লীতে পল্লীতে টহল দিয়ে বেড়াতে লাগল। নতুন করে এইরূপ মুসলিম জাগরণে হিন্দুদের মনে অতি মাত্রায় জল্পনা কল্পনা বাড়তে লাগল। কতক হিন্দু বললেন, লীগের সঙ্গে কংগ্রেস মিশে যদি একযোগে আন্দোলন চালায় তা'হলে বৃটিশের চেহারা রাগে আরো লাল হবে। কি জানি হয়তো ক্ষেপে উঠে ওঁরা জালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যা কাণ্ডকেও ছাপিয়ে যাবেন, নয়তো ইংরাজ সিংহ প্যাঁচে পড়ে 'সন্ধিচুক্তি' করতে পারেন।

এর আগে গান্ধীজীর 'সত্যাগ্রহ আন্দোলন' জোরালো হয়ে উঠলে বৃটিশ সরকার অতিষ্ঠ হয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে সন্ধি-চুক্তির কথা যেদিন তোলেন, সেদিন তাঁদের অতি বিনয় সহকারেই গান্ধীজী বলেন, 'আমি রাজ্য চাইনা, স্বর্গ চাইনা, পুনর্জ্জন্মও চাইনা, আমি শুধু আর্ত্তের দুঃখ নাশ করতে চাই। বিশ্ব জীবনের কাছে আমার ক্ষুদ্র জীবনের এই আত্ম নিবেদন।'

এই কথা শুনে লাটসাহেব নীরব হয়ে গেলেন। গান্ধীজীর এসব মহাত্মা জনোচিত বাণীতেই সকলে মুগ্ধ হয়েছেন। এঁরই প্রভাবে উৎকলের একচ্ছত্র নায়ক গোপবন্ধু দাসচৌধুরী তাঁর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরী ছেড়ে তাঁর স্ত্রী রমাদেবীকে নিয়ে সস্ত্রীক গান্ধীজীর মত [redacted] সেবায়' আত্ম নিয়োগ করেন। কেননা গোপবন্ধু দাসচৌধুরী

মহাশয় তখনই বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেশকে রক্ষা করতে হলে 'ক্রীত দাস' প্রথার মত হিন্দুর অস্পৃশ্যতা পাপকে সমূলে উচ্ছেদ করে জাতিকে কু-সংস্কার মুক্ত করতে হবে।

এসব তেজস্বী ত্যাগী শক্তিমান পুরুষরাই ভারতের রাজনীতি ও সমাজ নীতিকে নতুন রূপ দানে সমৃদ্ধ করেছেন। ভারতের সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল নেহেরু, এই দুই উগ্রপন্থী সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়কারী নবীন জননেতা বিদেশী বৃটিশ সরকার ও দেশের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জীবন সর্ব্বস্ব পণে যে আপোষ বিহীন দুর্দ্ধর্ষ সৈনিকের মত সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন তা' পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র যেন বাংলার স্বাধীনরাজা, শেষ নবাব সিরাজদ্দৌল্লা তাই বোধহয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র সিরাজের মহত্ব ও দেশ প্রেম সম্যক বুঝতে পেরেছিলেন। নবাবের নামে মিথ্যা কলঙ্কমণ্ডিত অপলাপকারী ইতিহাস বেত্তার ঐতিহাসিক অসন্তোষ প্রসূতীভূত জমাট মিথ্যার স্তম্ভ, বৃটিশের রচিত এই 'হল ওয়েল মনুমেণ্ট্‌কে' কলকাতার বুক থেকে তাঁর এককনায়কত্বেই তা' অপসারণ করেছেন। এ মহৎ কাজের বিনিময়ে নেতাজীকে কারাবরণ, অনশন, নিজের বাড়ীতে নজরবন্দী ও অনেক কিছু লাঞ্ছনা-দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়েছে।

ঈশ্বর অনুজ্ঞায় আবার এই নেতাজী সুভাষচন্দ্র সতর্ক প্রহরী বেষ্টিত নিজগৃহ হতে মারাঠা বীর সুচতুর ও দুঃসাহসী শিবাজীর মত নিরুদ্দেশ হন। এ অতি বিস্ময়কর ও রহস্যজনক ঘটনা।

এরপর ইয়োরোপের অভ্যন্তরে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘদিন অবস্থান। মুসোলিনী ও হের হিট্‌লার প্রভৃতি দেশনায়কদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন। দিকে দিকে রণসম্ভার ও আজাদী ফৌজীদল প্রস্তুতিতে খুব নাকি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এ সময়েই তাঁর সকল কার্য্যের সহকর্ম্মিনী এক অষ্ট্রিয়ান মহিলা শ্রীমতী ই, শেঙ্কলকে তিনি বিবাহ করেন ও অনীতা নামে এক কন্যারত্ন লাভ করেন।

তাই বোধহয় টোকিও বক্তৃতায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু একদিন তাঁর দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'ভারতে আমাদের কাজ হবে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা গুলির সমন্বয় করে, এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা। কোন বিশেষ সমাজ ব্যবস্থাকে মানব প্রগতির শেষ ফসল বলে উল্লেখ করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়'।

এরপর নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর স্বভাব সিদ্ধ দীপ্ত গরিমায় রাজনৈতিক নানা ঝড় ঝঙ্কার মধ্য দিয়ে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে (১৯৪৩) ২১শে অক্টোবর স্বগৌরবে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা সিঙ্গাপুরেই প্রথম উড্ডীন করেন। জাপান এই বিপ্লবী নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দান করে।

এর পর তাঁর স্বাধীন ভারতের সমরবাহিনী ও রণসম্ভার নিয়ে 'দিল্লীর লাল কেল্লা' অভিযানে আগুয়ান হন। তাঁর সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ে সমান মর্য্যাদায় গড়া হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান, শিখ প্রভৃতি মিলিত আজাদ ফৌজী দল নিয়ে কোহিমা, মনিপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর পথে ভারত ভূমিতে পদার্পন করেও, খাদ্যাভাবে ও দৈব বিড়ম্বনায় ইম্ফল ও ব্রহ্মদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের এ মহতী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। জে, এন, ভাদুড়ীও গ্রেপ্তার হয়েযান। এর সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনী, কর্ম্মীগণ, ও ওই সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিগণ দলে দলে গ্রেপ্তার হলেন। বন্দী অবস্থাতেই সকলে ভারতে ফিরে এলেন। ক্যাপ্টেন মোহন সিং, কর্নেল এন, সি, চ্যাটার্জ্জী, শা নওয়াজ, ধীগন, বুরবাদউদ্দীন, লক্ষ্মী স্বামীনাথন, রসিদ আলি প্রভৃতি।

আবার দৈব দুর্ব্বিপাক, নেতাজী সুভাষের (১৯৪৫) এপ্রিল মাসে রেঙ্গুন ত্যাগ ও ভারতের স্মরনীয় দুঃসময় ১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৫।

আজাদ হিন্দ ফৌজের লড়াই ও নেতাজীর নেতৃত্বে আমরা যে স্বাধীনতা পেতে চলে ছিলুম তার সব কিছুই যেন শেষ হয়ে গেল। —— সকল ফৌজীরা আজ বন্দী।

একি দুর্য্যোগ। সমর-বিজয়ী নেতাজী সুভাষচন্দ্র অভাবে সারা ভারতবর্ষের ভারত নেতারা যেন অভিমন্যু বধের মত পুত্র শোকে মর্ম্মাহত হয়ে পড়লেন। সকলে শোক সন্তপ্ত হৃদয়েই আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজীদের বন্দী করার প্রতিবাদে ভারতবর্ষের পার্কে, মাঠে, হাটে, বাজারে সর্ব্বত্র সর্ব্বদলীয় নেতাদের একযোগে চাপারাগের ওপরেই বন্দীদের মুক্তিদাবী ঘোষণা করা হোল।

ইতোমধ্যেই আজাদী ফৌজীরা সকলে বন্দী অবস্থাতেই ভারতে ফিরে এলেন। দিল্লীতে লাল কেল্লায় ৫ই নভেম্বর (১৯৪৫) আজাদ-হিন্দ্ ফৌজী বন্দীদের বিচার আরম্ভ হল। স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, শরৎচন্দ্র বসু, ভুলাভাই দেশাই, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, নবাব জাদা লিয়াকাত আলিখাঁন, কায়েদে আজম জিন্না, মহাত্মা গান্ধী ভারতের আরো আইনজ্ঞেরা ও দেশ নেতারা বন্দী মুক্তি দাবী নিয়ে এক সঙ্গে রুখে দাঁড়ালেন।

বন্দী মুক্তি পর্ব্ব শেষে দিগ্বীজয়ী নেতাজীর অভাব দেশের সকলকে আবার ব্যথিত করে তুললে। ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৫কে মনেকরে পথ-রোধকারী বৃটিশের ওপর সমগ্র ভারতবর্ষ রাগে একেবারে জ্বলে উঠলো। বারুদ ভরা কামানের অগ্নুদ্গারের মত বীর কেশরী লীগ নেতা জিন্না বিজয়ী নেতাজীর পথরোধকারী লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ও ব্রিটিশ বাহিনী শত্রুদের শাসিয়ে যেন বারে বারে বজ্র নিনাদে গর্জ্জে উঠ্লেন যে, এর যোগ্য প্রতিশোধ নিতে ভারতেই আমি মহা সমরানল প্রজ্জ্বলিত করব, ওই নির্দ্ধারিত ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ শুক্রবার।

১৫ই আগষ্ট (১৯৪৬) বন্ধুরা বসে আলোচনা করছি। আগামী কাল লীগের জোর মিটিং। লীগ সম্প্রদায় সদলে মহরম আখড়ার সরঞ্জামে মিছিল করে যাবে কলকাতায় মনুমেন্টের তলায় 'গড় ময়দানে'। এইবার দেখাযাবে লীগ সিদ্ধান্ত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আন্দোলন' কেমন করে আরম্ভ হয়।

লক্ষণ বললে, কংগ্রেস কিন্তু প্রত্যক্ষ সশস্ত্র সংগ্রাম বলে কিছু কোন দিন করেনি। কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রাম গান্ধীজীর 'অহিংসা অসহযোগ সংগ্রাম'। ভারত স্বাধীন করতে দেশ কর্ম্মীরা এই আন্দোলনকে আজ যে দৃষ্টিতে দেখছেন, আগে তা' দেখেননি। প্রথমকার আন্দোলন কর্ম্মজীবনে কর্ম্মীরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করার দায়িত্বকে এতটা গুরুত্ব না দিয়ে বোধহয় ভেবে ছিলেন যে, সরকারী দপ্তর গুলোকে এদেশের মানুষের বেষ্টনে ঘিরে বৃটিশ শাসকদের স্থলে নিজেরাই শাসক হয়ে বসবেন। এমনই একটা ছেলে মানুষি ভাব নতুন দেশ কর্ম্মীদের মনে দানা বেঁধে ছিল। এবং দেশকর্ম্মীদের বিক্ষিপ্ত চঞ্চল আন্দোলনে বৃটিশ কর্ত্তাদেরও চঞ্চল করে তুলে ছিল।

কিন্তু দেশ কর্ম্মীদের কাজের ছেলেমানুষি ভাবগতিক দেখে, তারসঙ্গে দেশে কংগ্রেস বিরোধী গোষ্ঠী সংখ্যায় বেশী দেখে ধুরন্ধর বৃটিশ শাসকদের কাছে নিজেদের ও দেশের লোকের মনের সকল দুর্ব্বলতা সামাল দিতে গান্ধীজী তড়িঘড়ি যখন লর্ড রিডিংয়ের সন্ধির আমন্ত্রন কায়দা করে উপেক্ষা করলেন। এবং সকল কংগ্রেস আন্দোলন সংগ্রাম আপাততঃ স্থগিত রাখলেন। তখন কংগ্রেস বিরোধী দেশবাসীরা সমস্বরে বলে উঠলেন, 'হিমালয়ান ব্লাণ্ডার'।

আবার কংগ্রেস নেতাদের দীর্ঘদিন নীরব কর্ম্মসাধনায় গোষ্ঠীবরচনা ও বৃটিশের কার্য্যকলাপ অনুশীলন পর ১৯৩০-৩১ সালের আন্দোলনে কর্ম্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধি তৎসহ তাঁদের কর্ম্মদক্ষতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে শৃঙ্খলা রক্ষার অগ্রগতি দেখে গান্ধীজী সন্তুষ্ট চিত্তে যখন লর্ড আরউইনের সন্ধি চুক্তির আমন্ত্রনে সমান মর্য্যাদায় বসে, চুক্তির কথাবার্ত্তা বলে কংগ্রেসের আন্দোলন স্থগিত রাখতে দ্বিধা করলেন না, তখনও দেশের লোক হ'ল অসন্তুষ্ট ও কর্ম্মীদের অনেকে বিরক্ত হলেন। নীতির দিক্ থেকে যুদ্ধ জয় হলেও সকলে সন্তুষ্ট হতে পারলুম না। এমনই আমরা ও আমাদের সামগিক মনোভাব।

১৯৩১ সালের পর বেশীর ভাগ কর্ম্মী তাঁদের কর্ম্মের ভুল ভ্রান্তি যাঁরা নজর করলেন, তাঁরা বুঝলেন যে যতটা শক্তি প্রয়োগ করলে বৃটিশ শক্তির অবসান হয়, ততটা শক্তি তাঁরা অর্জ্জন করতে পারেন নি। সুষ্ঠু সংগ্রাম করতে যতটা নিরভিমান বীর্য্য শক্তি ও কর্ম্মীদের কর্ম্ম নিষ্ঠার প্রয়োজন হয় ততটা শিক্ষা তাঁদের নেই। এই অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরাই জানিয়েছেন যে, স্বাধীনতা এখনও তাঁদের মুঠোর মধ্যে আসেনি বটে, তবে তা' অর্জ্জন করবার জন্য যে শক্তির দরকার তার সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন। তাই আরো ত্রুটিহীন নিপুন দক্ষতা অর্জ্জনে তাঁরা নীরবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামী মন পালটে, সংগঠনী মন নিয়ে আবার দেশ সেবার কাজে ডুবে যেতে পারলেন।

কিন্তু লীগের ওসব কিছুর বালাই নেই। শ্লোগানই হচ্ছে, 'মারকে লেগাঁ-লাড়্‌কে লেগা'। আর এক আছে তা' অন্যায় ঢাকতে ধর্ম্মের দোহাই।

এক বন্ধু বললেন, লড়্‌কে-মারকে যদি বলতে হয়, সে হ'চ্ছে হের হিট্‌লার। লড়ায়ের নিত্য নতুন কৌশল ও একের পর এক দেশজয় করা এ একটা অভূতপূর্ব্ব কাণ্ড। সারা বিশ্ব কাঁপিয়ে সংগ্রামের আলোড়ন। পৃথিবীটাকে একেবারে গাছ নাড়ার মত নড়া-চাড়া দিতে এমন আর দেখা যায়নি। ফলে সব দেশই নতুন করে চেতনা লাভ করেছে। অথচ শুনি, হিট্‌লার খুব ধার্ম্মিক ও খুবই নাকি শান্তি প্রিয়। এর জ্বলন্ত নজির—তিনি তাঁর যুদ্ধে হেরে পালিয়ে গেলেন তবু তাঁর এক্তিয়ারে 'এ্যাটম্‌বোম' থাকতেও তা' তিনি ব্যবহার করলেন না। তিনি তাঁর রুচি অনুযায়ী মনে করলেন, যুদ্ধের গোঁয়ার্ত্তমী বজায় রাখতে গিয়ে পৃথিবীর কোটি কোটি বছরের কৃষ্টি-সাধনা বিস্ময় কর স্মৃতি সৌধ ধ্বংস করা উচিত হবেনা। এতে করে মানুষের কল্যাণ ও ক্রমোন্নতি চিরতরে পিছিয়ে যাবে।

পূর্ব্ব বক্তা বললেন, লীগনেতাও তো শৃঙ্খলা প্রিয় ও শান্তি কামী।

তাই লীগের নির্দ্দেশ ছিল যে, দেশে আন্দোলন সময়ে দেশ নেতাদের নির্দ্দেশ না মেনে চলার মত দেশদ্রোহীদের ছুরি মেরে দেশদ্রোহীতা বন্ধ করবে, কিন্তু ছোরা মেরে নির্ব্বোধ নিরীহদের একে বারে প্রাণে হত্যা করবে না।

এরূপ দেশ নেতাদের নির্দ্দেশ মানবার মতআনুগত্য ও নিষ্ঠাবাণ স্বেচ্ছা সেবক রাখতে জিন্না সাহেব কংগ্রেসে থাকা কালীন প্রায়ই বলতেন, 'কংগ্রেসের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বাছা বাছা বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত লোক কংগ্রেস দলে নিতে হবে। খুব কম শিক্ষিত হলেও অন্ততঃ তারা ম্যাট্রিকুলেট হওয়া চাই'। এখন আবার তিনি মুসলিম লীগ থেকে বলছেন, 'আমরা ইসলামের শারিয়াত মতে রাজ্য শাসন করতে চাই। অর্থাৎ উনি বলছেন, শাসন শোষন তো দূরের কথা, মানুষ মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করলে তা' মহাঅপরাধ বলে গণ্য করা হবে'। তবেই দেখুন মিঃ জিন্না কত ধার্ম্মিক ও কত উন্নত স্তরের শান্তি প্রিয়।

এই আলোচনা বৈঠকে আচম্বিতে এসে দাঁড়াল প্রতাপ। বললে, তার দাদা শিলিগুড়ি যেতে লিখেছেন। প্রতাপ ওরফে প্রতু তার সঙ্গে আমাদের নিয়ে যেতে চায়। কিছুতেই ছাড়বে না। এ অনুরোধ এ্যাড়ানো শক্ত দেখে শেষে ঘুরেই আসব ঠিক করলুম। আমরা যাব শুনে প্রতুতো তার চিন্তা থেকে রেহাই পেল। জলযোগ সেরে খুব খুসী হয়েই বাড়ী ফিরল। আর এদিকে আমরা প্রতুর মত চঞ্চল হয়ে বাক্স গুছানো, ধোপার বাড়ী ছোটা মোটা উলের মোজা ও গরমের কোট কেনা নিয়ে ব্যস্থ হয়ে পড়লুম।

১৬ই আগষ্ট শুক্রবার হরতাল। ট্রেন পাওয়া যাবে কিন্তু দোকান হয়তো খোলাই পাব না। তাইতো! এই পুরাণ ওভার কোট্টা নিয়েই যেতে হবে। আমার ছেলে বাবলুর একটু শরীর খারাপ তা' হোক, দাদার ছেলে সন্তুকে নিয়েই যত ভাবনা। আবার ঠাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর না করে বসে। সবে রিউম্যাটিক্ ফিভার থেকে উঠেছে। এসব চিন্তায় রাত্রে ভাল

ঘুমই হলনা।

ভোর থেকে তোড় জোড় লাগিয়ে কোন রকমে সব গুছিয়ে নিলুম। ট্রেনে খাবার জন্যে লুচি ও মাংস টিফিন কেরিয়ারে রাখা হয়েছে। সময় প্রায় পাঁচটা হয়ে এলো। প্রতু এইবার আসে বলে। আমাদের সাজ গোজ প্রায় হয়ে গেছে। দার্জিলিং মেলে আমরা যাব। কিন্তু না, প্রতু আসতে বেশ দেরী করছে। একটু একটু করে মনে মনে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠছি।

সহসা দেখি, মাসুদা রহমান ঘরের মধ্যে দ্রুত ঢুকে এলো। খুবই ব্যাস্ত এস্ত মলিন মুখ। মাসুদা রহমান কাছে এসে ভীত কণ্ঠে চুপি চুপি বললে, 'দাদা আপনাদের আজ যাওয়া হবে না। কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের ভীষণ দাঙ্গা। মরা মানুষে রাস্তা ভর্ত্তি হয়ে গেছে'।

খবর শুনেই তো ভয়ে আমাদের সকলের হৃদকম্প আরম্ভ হল। সকলেই হতবাক্। শিলিগুড়ি যাওয়া ঘুচে গেল। বুঝলুম তাই প্রতু এলোনা।

খবর জানতে পাড়ায় বেরিয়ে দেখি, প্রতিবেশী হিন্দু ও মুসলমান এক এক দিকে দল পাকিয়ে বসে। সকলে দাঙ্গার কথা শুধু গল্পের মত বলে যাচ্ছেন। আত্মরক্ষা বা সকলের শান্তিরক্ষার কথা কেউ-ই আলোচনা করছেন না। বরং কে কি ক'রে দাঙ্গাকারীদের লুকিয়ে-পালিয়ে কাজে যাবেন, সেই আলোচনাই সকলে করছেন।

ব্যবসাদার বলছেন, কাল থেকে রোজ ভোরে বেরিয়ে যাব। শিক্ষিত কেরানী বাবুরা বলছেন, বাসে আর যাবনা, যাব ট্রেনে। কেউ বলছেন, ট্রেনে না গিয়ে ভাবছি হেঁটেই যাব। নইলে হরতালের গোলমাল ও দাঙ্গা থেকে বাঁচা যাবেনা। কেউ বলছেন, কাল থেকে ধুতিচাদর পোরে যাব এতে আমরা অফিস করতে যাচ্ছি বলে কেউ বুঝতে পারবে না। কাজেই নিরীহ ভদ্র বাঙ্গালী মনে করে আর কেউ মারপিঠ করতে আসবে না। এই সব নানা কৌশলের কথা শুনতে শুনতে বাড়ী ফিরে এলুম।

ষষ্ঠ পর্ব্ব

দাঙ্গার বিস্তৃতি ও সন্ত্রাসবাদী দল

রাত্রিতো কাট্‌লো অনিদ্রায় ও হুতাশে। প্রভাত না হতেই বেরিয়ে পড়্‌লুম রাস্তায় চারিদিকের অবস্থা জানতে। জায়গায় জায়গায় মানুষের ভিড়। একই কথা নিয়ে সকলে জটলা করছেন। সকলেরই সশঙ্কিত অবস্থা। নতুন নতুন খবর সংগ্রহের জন্য সকলেই ব্যস্ত।

গত রাত্রে জায়গায় জায়গায় অনেক রকমের জমায়েত্ হয়ে গেছে। অনেকে আশঙ্কা করছেন এখানেও বোধহয় গোলমাল হবে। স্থানীয় কংগ্রেস ও লীগ নেতারা, এখনকার বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে পিসকমিটী তৈরীর চেষ্টা করছেন। 'পিস্‌কমিটী' দলও খাড়া হয়েছে শুনলুম। প্রতিবেশীরা অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছেন যে, গোলমাল এখানে আর হবেনা। মস্ত ভাবনার বোঝা যেন সকলের মাথা থেকে নেমে গেল। বাড়ী গেলুম। আবার একটু একটু করে সবার মুখেই হাসি ফুটে উঠলো।

এখানকার গোলমাল থেমে গেলেও বাইরের খবরে আবার সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্‌ছেন। রাস্তায় একটিও গাড়ী চলেনা। শুধু 'গুড্‌স্‌-ট্রেন' ও ট্র্যাফিক্ লরী মাঝে মাঝে চলছে। বাইরের খবরও সঠিক কিছু পাওয়া যাচ্ছেনা। ফোনে আত্মীয় স্বজনদের খবর নেই, তাও সব সময় ফোনের কনেক্‌সন্ পাইনা। এইভাবে খুব চঞ্চলতার সঙ্গেই দিন কেটে গেল।

আমরা মনে ভাবছি, লীগের একি রাজনৈতিক আন্দোলন না শুধুই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছিনা। কিন্তু কংগ্রেসের আন্দোলন বিপ্লবে গান্ধীজী দাঙ্গা কখনও চাননি। বরং গান্ধীজী বলেছেন

শাসন যন্ত্র এবং সমাজকে পরিবর্ত্তন করতে চাই আমি বিপ্লব, সত্যিই আমি বিপ্লব চাই। কিন্তু রক্তের সাগরে স্নান করে নয়। রক্তের পথে যে বিপ্লব আসে, সে বিপ্লবকে আমি ঘৃণা করি। আমি চাই মানুষকে সেই বীভৎস বিপ্লব থেকে বাঁচাতে।

আমাদের পরের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া প্রধান কাম্য হলেও প্রথম কাম্য হওয়া উচিত নিজেদের মনের যত রকমের ব্যাধি তা' দূর করা। নিজেদের মধ্যে জাতিভেদ, দেশে দেশে রেশারেষি, স্বার্থ-পরতা, দেশদ্রোহীতা, পরনিন্দা, মানুষকে অস্পৃশ্য করে রাখার ব্যাধি থেকে দেশও জাতিকে আগে মুক্ত করা। এইভাবে কংগ্রেসের আন্দোলনের মধ্যে গান্ধীজী আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধি ব্যবস্থা নিরসনের এক নতুন পথে চলবার স্পষ্ট নির্দ্দেশ দেন।

ভারত স্বাধীন করার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মূর্ত্ত প্রতীক হলো 'জাতীয় কংগ্রেস'। আর এই কংগ্রেসই শেষে গান্ধীজীকে 'নেতা' বলে মেনে নেয়। নেতার চিন্তা ধারার সঙ্গে কংগ্রেস কর্ম্মীদের পরিচয় থাকবে, এটা আশাকরা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা এমনই অবুঝ কর্ম্মী যে নেতার চিন্তাধারার কোন খোঁজই কেউ রাখিনা। একটুও ভাবিনা যে, দেশ সেবক নামধারী নতুন দেশ কর্ম্মী আমরা নতুন কাজে চলেছি। একাজ সু-সম্পন্ন করতে কর্ম্ম কৌশলের নীতি যাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে হয় সে খোঁজ করে জেনে নেবার জ্ঞান ও ধৈর্য্য আমাদের নেই।

অথচ নতুন পথযাত্রী আমরা ভুল করে পুরান দেশকর্ম্মীদের ভুল পথে ক্ষিপ্রগতিতে চলেছি। এই হঠকারিতার ফলে অনেক অপরিহার্য্য জানার বিষয় বেশ অজানাই থেকে যায়। এবং অজানা কারনেই চলার গতি ক্রমশ মন্দ হয়, সাহসের স্থলে মনে সন্দেহ ভীতির উদ্রেগ হয়, ফলে ধীরে ধীরে আন্দোলন থেমে যায়। থামার কারণটা না বুঝে আন্দোলনের বাইরে থেকেই আমরা বলি যে, নেতার পরিচালনার দোষেই সব ব্যর্থ হল, এখানে স্বাধীনতা সংগ্রাম যজ্ঞের আর এক ইতিহাসের কথা উল্লেখ করব, যা

নাকি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও হঠকারিতারই এক বিরাট দুঃখময় ফল। ১৮৫৭ সালে শ্রীমন্ত, নানা সাহেব, রাণী দুর্গাবাই, আজিমুল্লা খাঁন, মহারাষ্ট্রের সেনানায়ক তাঁতিয়া টোপী, নানার আমীর, বাবা সাহেব, বালা সাহেব, রাও সাহেব, সুবেদার টিকা সিং, সিপাহী নায়ক শামসুদ্দিন খান, জমাদার দলগঞ্জম সিং, সুবেদার গঙ্গাদিন, মঙ্গল পাঁড়ে, বিহারের কুমার সিং, অমর সিং, শামসুদ্দিন ও এঁর প্রিয় নর্ত্তকী আলিজান বিবি, শাহমহম্মদ হোসেন, আহম্মদ উল্লা, ওয়াজুল হক, পাটনার পীর আলি, মহান যোদ্ধা সম্রাট বাহাদুর শাহ বখৎখান, রাণী লক্ষ্মীবাই, স্বামী গঙ্গাধর বাবাজী, গুরু নানক মহারাজ প্রভৃতির নেতৃত্বে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের এক মহাপ্রলয় সৃষ্টি করা হয়েছিল। ভারতের দিকে দিকে চলেছিল 'শিকল ভাঙ্গার বহ্নি উৎসব'। কিন্তু দলের শৃঙ্খলার অভাবে ও মতের একতা না থাকায় একান্ত হঠকারিতার দোষে ও তার সঙ্গে দেশের ঘুষখোর খয়ের খাঁদের বেইমানীতে সকল আন্দোলনের বিষয়ে আগে থাকতেই সরকারের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। বৃটিশ সজাগ হয়ে নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম অত্যাচারে মেতে উঠলেন। ভারতের দেশদ্রোহী লোভী বৃটিশ তাঁবেদারদের সহায়তায় ব্রিটিশ সরকার বেপরোয়া চালানের গোলা ও গুলি। পল্লীতে পল্লীতে গোরা সৈন্যেরা ঢুকে ঢুকে কুটিরে কুটিরে জ্বালিয়েছেন আগুণ। বৃদ্ধ, যুবা, নারী, শিশু হাতের কাছে যাকে পেয়েছে, তাকেই টেনে নিয়ে নির্ব্বিবাদে ঝুলিয়েছেন ফাঁসির দড়িতে। নির্ম্মম বেত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত করে দিয়েছে সহস্র সহস্র দেহ। সঙ্গীনের খোঁচায় কতশত অসহায় নিরীহ মানুষ ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে। পুরো একমাস ধরে বৃটিশ দিনরাত চালিয়েছেন বিরাম হীন নারকীয় ধ্বংস লীলা।

অথচ অতীব দুঃখ ও অনুতাপের বিষয় যে, এই মহা প্রলয়ের বিপ্লব ও ব্রিটিশের অমানুষিক অত্যাচারের দিনেও ভারতের স্বাধীন রাজ্যের বহু রাজন্য বর্গ নিজেদের দলবল সহ রাজশক্তি নিয়ে একান্ত নিরপেক্ষ হয়ে নীরবে দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন একেবারে নির্ব্বিকার।

কাজেই দেশ প্রেমিক রথী-রথীদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ সঙ্গে মহা-প্রাণ গুলি একে একে চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেল। শুধু ভারতের বুকে স্মৃতিপটে পাষান হয়ে রইল, ভারতের মুক্তি দলের মহাপ্রলয় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের মহতী প্রচেষ্টা। ব্যর্থহল সকলের মৃত্যুপণ শপথ সংগ্রাম।

এই সব অভিজ্ঞতা থেকেই মহামতি গোখলে প্রথম সাক্ষাতেই গান্ধী-জীকে বলেন, যদি ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে কাজ করবার ইচ্ছে থাকে, তবে সেকাজ করতে হঠাৎ কিছু যেন একটা করে বসনা। তার আগে ভারতবর্ষকে ভালকরে দেখতে হবে, জানতে হবে, অন্ততঃ এক বছর সারা ভারতবর্ষকে ঘুরে ঘুরে দেখে, সকল দেশের সকল জাতির সঙ্গে খুব ভাল ভাবে মিশে, তাদের স্বভাব, আচার-ব্যবহার, তাদের চলতি সংস্কার দেখে, চিন্তা করে বুঝে যুক্তি পরামর্শ করে, তারপর যা' ভাল বিবেচনা করবে, তাই করবে। অর্থাৎ সর্ব্বস্তরের সমাজ ও লোক চরিত্র না বুঝে, কোন রূপ সংগ্রাম পরিচালনা করবে না।

গান্ধীজী মহামতি গোখলের উপদেশ গুলি বর্নে বর্নে মেনেও কংগ্রে-সের নেতৃত্বে তিন তিনবার আন্দোলন সংগ্রামে ব্যর্থকাম হলেন। আর কংগ্রেসের ডাকে দেশ সাড়া দেবে না, এইটাই ছিল স্থির বিশ্বাস। কিন্তু দেশের নতুন কর্ম্মীদের দোষগুণ ও হঠকারীতার ভুল, সব নিজের গায়ে মেখে নিয়ে গান্ধীজী তাঁর লেখায় কথা বার্ত্তায়, বক্তৃতার মাধ্যমে বলতে আরম্ভ করলেন, আমি ও আমরা কংগ্রেস সংগ্রামে কেহই পরাজিত হইনি। বরং সত্যাগ্রহীদের সাফল্য সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়েছি। পাহাড় দেখলে খুব নিকটে মনে হয়, কিন্তু চলতে আরম্ভ করলে তার দূরত্বের পরি-মাণ টের পাওয়া যায়। আমাদের সংগ্রামীদের হয়েছে তাই-ই। পথের পরিচয় ছিলনা বলেই আমরা অজ্ঞ ছিলুম।

গান্ধীজীর এরকম পর্ব্বত প্রমাণ ভুলের কথাও মানুষ ভুলে গেল। গান্ধীজীর ডাকে আবার দেশের লোক সাড়াদিল। যার ফলে ১৯২০-২২

সালে **Non Violence & Non Co-operation Movement** স্থগিতের পর ১৯৩০-৩১ সালের **Civil Disobedience Movement** পরিচালনা করা আরো সহজ হয়েছে।

এরপর প্রবল আত্ম-বিশ্বাসী গান্ধীজী নিপুণ যোদ্ধার মতই তাঁর চরকা ও খদ্দরের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধমান তূনীরে আর একটি অমোঘ অস্ত্ররূপী শর যোজনা করলেন। সেটি হচ্ছে, আমাদের জাতির অজ্ঞতা প্রসূত 'অস্পৃশ্যতা' দূরীকরণ। গান্ধীজীর কর্ম্মযোগের এ হেন পরিস্থিতিতে দেশের লোক রাজনীতি থেকে সহসা সমাজ নীতির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। এতে সমাজ নেতাদের অনেকেরই চেতনা হল ও তারা বুঝতে বেশ সক্ষম হলেন যে, ভারতবাসীদের ধর্ম্মের নামে অন্ধ সংস্কারে রাস্তবিকই আজকের সমাজের কি পরিস্থিতি হয়েছে ও সাধারণ মানুষের স্থানইবা আজ কোথায়।

মাত্র বিজাতীয়দের স্পর্শ দোষ ও যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি একটু ভুলের কারণে কঠোর সমাজ বহিস্কার নীতি পালনেই এই ভয়াবহ অজ্ঞতা প্রসূত 'অস্পৃশ্য জাতির' সৃষ্টি হয়েছে। আজ পর্য্যন্ত হিন্দু জাতির এই সমাজ-ভুলের কোন কার্য্যকর প্রতিকার নেই।

অথচ কেন আমরা বুঝতে চাইনা যে, আমাদের এই ভারত অভিযানে যতসব অজ্ঞাত শক্তির দুর্নিবার তাড়নায় উন্মাদ কলরবে যে সব মানবের দল বারে বারে এদেশে এলো, তারা সব আজ গেল কোথায়? শক্, হুন, তিব্বতীয়, মঙ্গোলীয়ান, ডাচ্, পর্ত্তুগীজদের অনেকে আজ কোথায়? তারা কি আমাদের দেশের জাতির সঙ্গে পূর্ণভাবে মিশে যায়নি? না তাদের ভাষা আমাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করেনি?

এমন সময় প্রতিবেশীদের খবরের ওপর খবর। জুটমিল লাইনের মুসলিম ভায়েরা আজ খুব উত্তেজিত হয়েছেন। গোলমাল দাঙ্গা যাহোক একটা কিছু আজ বোধহয় এখানে হবেই। 'পিস্‌কামিটী' আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। খবরটা চারিদিকে না ছড়িয়ে সরে পড়লুম বাড়ীতে সেখানেও ঐ একই খবর। অনেক রাত্রি অবধি দুশ্চিন্তা করে সবে শুয়েছি,

এমন সময় মহা সোরগোল উপস্থিত। রাত্রি তখন হবে আড়াইটা। চারিদিকে শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। আল্লা হো আকবর এর বজ্রধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল।

সকলে ছাদে গেলুম। দূরে আগুণের লেলিহান শিখা দেখতে পেলুম। আগুণ আর উল্লাস ভরা 'হল্লা' ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে লাগল। আর্ত্তনাদের চীৎকার, শাঁখের শব্দ, আল্লা হো আকবরের ধ্বনি মিশিয়ে একটা আতঙ্কভরা সঙ্কটময় অবস্থা সৃষ্টি করল। একবার 'হল্লা' থামল, নিচে নেমে এলুম। আবার 'হল্লা' এই করে ভোর পাঁচটা বেজে গেল।

সাইকেল নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি, একটু দূরে আবার নতুন করে আগুণ লাগান শুরু হয়েছে। চারিদিকে সন্ত্রস্ত ভাব। সকলে বলাবলি করছেন, লীগ নাকি আজ জেহাদ ঘোষণা করেছে। আজ আরো জোর করে গোলমাল হবে। বিশিষ্ঠ হিন্দু জমিদার ও হিন্দু মাতব্বরদের আগে মারবে। খবর শুনেই বাড়ী ফিরলুম।

বাড়ী ফেরার মুখে যেসব মুসলমান ভায়েদের সঙ্গে দেখা হল। তাঁদের অনেকেই মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ালেন। যাঁরা সেলাম দিয়ে ভালবাসা জানাতেন, তাঁরা আজ আর সেলাম দিলেন না। একটা কথা পর্য্যন্ত কেউ বললেন না আমার সঙ্গে। বুঝলুম অবস্থা সত্যই খুবই ঘোরাল। বাড়ীর কাছে অচেনা বহু পশ্চিমা মুসলমান পাড়ার মধ্যে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরা ফিরা করছেন। কতক আমাদের বাড়ীর গলির মোড়ে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে। এঁদের সঙ্গে প্রতিবেশী মুসলমানও দু'চারজন আছেন।

বাড়ী ফিরছি, আমাকেই ধরে বল্লেন, 'বাহারকা আদমী মহল্লামে ঘুষনে নেহি দেগা'। একেবারে গায়ে হাত দিয়ে আপত্তি জানালেন। অবস্থা দেখে, শেষে বাধ্য হয়ে তাঁদের ঠেলেই বাড়ী যেতে হোল। দূরে জোরে হল্লা উঠলো 'দুবে খুন'। বেলা তখন হবে ন'টা। প্রতিবেশী মুসলমান ভায়েদের খুব চঞ্চল হয়ে উঠ্তে দেখলুম। বাড়ীর সম্মুখ রাস্তায় অপরিচিত মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে দেখে, অতি দুঃসাহসের সঙ্গেই

মেয়েদের ও অন্যান্য সকলকে দ্রুত স্থানান্তরিত করা হল, সঙ্গে ছিলেন সুবল মাইতি, অনিল দত্ত ও অশ্বিনীদা।

পাড়ার বৈরাগীদের বাড়ীতে আগুণ দেবে শুনছি। ওরই কাছাকাছি আমার বন্ধু গিরিজা মিত্রের সিগারেটের দোকান লুট হয়ে গেছে। এ লুট করার ব্যাপারে দু'চারজন হিন্দুরও যোগ আছে জানতে পারলুম। এরা এখানকার গুণ্ডা পার্টি। এদের মধ্যে কিন্তু হিন্দু মুসলমানের কোন ঝগড়া নেই। হাঙ্গামার সুযোগ নিয়ে লুটতরাজ করাই এদের কাজ। এদের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের অভিন্ন মিল দেখে, এত দুঃখেও বলতে হয় যে, ইচ্ছে করলে হিন্দু মুসলমান একত্রে নির্ব্বিবাদে বেশ মিলে মিশে থাকতে পারে। কিন্তু সে সহজ ইচ্ছে আমাদের মনে আজও জাগছেনা

এদিকে দেখছি, চারিদিকে থম্‌থমে ভাব। মিল, ফ্যাক্টরী, দোকান, বাজার সব বন্ধ। যে যার বাড়ীর গরু বাছুর, মাল পত্তর মাথায় করে যে যার জাতের মহল্লার দিকে চলে যাচ্ছে। হিন্দু ও মুসলমানের মনে একটা বিভেদের ভাব জোরাল ভাবেই ফুটে উঠ্‌ছে। কারো মনে শান্তি নেই।

এ যেন সারা দেশে এক ধরণের বড় রকমের গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। মাত্র মুসলিম লীগ সম্প্রদায়ই যেন এরূপ ভারত জোড়া বিরাট বিশৃঙ্খলা আনছে মনে হচ্ছে, এ আন্দোলনে আর অন্য কোন দলের যোগসূত্র দেখা যাচ্ছেনা। সব দলই নীরব দর্শক।

কিন্তু কংগ্রেস আন্দোলনের আলোড়নে তবু কিছু দলের যোগসূত্র দেখতে পাওয়া গেছে। সে আন্দোলন ছিল পরস্পার দলের সম্পার্ক রহিত ও বাইরে থেকে বিভিন্ন দেখতে হলেও, সেছিল যেন একই যোগ সূত্রের অভিন্ন সম্বন্ধ। তখনকার কংগ্রেসের **Non Violence & Non Co-operation Movement** আজকের লীগ আন্দোলনের মতই উদ্দাম বেগেই চলেছিল। তাই ১৯২০-২২ সালের কংগ্রেসের আন্দোলনে যথেষ্ট আবেগ ছিল, উত্তেজনা ছিল, কিন্তু কর্ম্মীদের অনেকের মধ্যে তেমন করে ধৈর্য্যের সঙ্গে বিচারের ধীরতা ও মতের দৃঢ়তা ছিলনা।

তবুও ১৯২১-২২ সালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলন এক বিশিষ্ট ভূমিকা নিল। যেমন গান্ধীজীর আন্দোলন একদিকে বেড়ে উঠল তেমন অন্যদিকে সশস্ত্র যুব-অভ্যুত্থান ভারতে ব্যাপক ভাবে প্রবল আকার ধারণ করল। কলকাতা, ঢাকা, চন্দননগর, মেদিনীপুর, কুমিল্লা চট্টগ্রাম, সীবাট, বেনারস, এলাহাবাদের বিপ্লবের অগ্নিস্ফুরণ হতে থাকল। এইসঙ্গে শ্রমিক ধর্মঘট, বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন ও ব্যাপক হরতাল আরম্ভ হয়ে গেল।

শান্তিরক্ষার অজুহাতে সরকার বিবিধ দমন নীতির অর্ডিন্যান্স জারী করতে লাগলেন। নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর গুলি চালানো শুরু হল। ব্যাপক ধড়পাকড়, সংবাদ মুদ্রণে নিষেধাজ্ঞা, কংগ্রেস ও তার যাবতীয় সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠানকে বে আইনী বলে ঘোষণা করা হল। চণ্ডনীতিতে সরকার বেপরোয়া অকথ্য অত্যাচার দেশের সর্ব্বত্র আরম্ভ করলেন। সরকারের এ অন্যায়ের প্রতিবাদে সন্ত্রাসবাদী দলও দিকে দিকে মরিয়া হয়ে উঠে, অত্যাচারী ইংরেজ ও দেশের বিশ্বাসঘাতক খয়ের-খাঁদের হত্যা করে প্রবল ভাবে প্রতিশোধ নিতে লাগলেন।

এতেও ব্রিটিশের দমন নীতি কমছেনা দেখে, রণগুরু শ্রীঅরবিন্দ, দলপতি রাজেন লাহিড়ী, মাষ্টারদা সূর্য্য সেন, রামপ্রসাদ, আসফাক উল্লা, যোগেশ চাটুয্যে, চন্দ্রশেখর আজাদের চরম পন্থী বিপ্লবী দল যুগান্তর সঙ্ঘ, অনুশীলন সমিতি, শ্রীসঙ্ঘ, বেঙ্গল ভলেণ্টিয়ার্স এরাও শেষ পর্য্যন্ত অত্যাচারী ব্রিটিশ ও দেশ দ্রোহী খয়ের-খাঁ-নিধন-যজ্ঞ চারিধারে আরম্ভ করে দিলেন, অবশেষে পর্দ্দা ছিঁড়ে আগ্নেয় অস্ত্র হাতে নিয়ে মেয়েরা ঘরের বাইরে এসে ব্রিটিশের সঙ্গে সম্মুখ সমরে মোকা-বিলা করতে শুরু করে দিলেন। দেশের এরূপ পরিস্থিতি দেখে, কংগ্রেসের অহিংশ নীতি বজায় রাখতে গান্ধীজী তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন আপাততঃ বন্ধ রাখলেন ও সত্যাগ্রহীদের আন্দোলন থেকে সরিয়ে নিলেন।

প্রকৃতপেক্ষ ১৯২০-২১ সালের পর হতে জাতির দেহে স্বাধীনতা

অর্জ্জনের নতুন প্রাণ শক্তির সঞ্চার শুরু হয়। আবার যখন দিকে দিকে বিপ্লবীরা আগ্নেয় অস্ত্র হাতে নিয়ে জেগে উঠে, সকলে সম্মুখ সমরে মেতে উঠলেন, তখন গান্ধীজী এ ঘটনাকে লক্ষ্য করে বললেন, এ সংগ্রাম 'সংঘর্ষ' নয়, যুদ্ধও নয়, এ হ'চ্ছে নিছক 'আত্মোৎসর্গ'।

তবুও ১৯২১ সালের শেষ ভাগে পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়ের দেড় বছরের জন্যে কারাদণ্ড হল। রাজা গোপাল আচারী, দেবদাস গান্ধী, যমুনা লাল বাজাজ, ডাক্তার আন্সারী, হাকিম আজমল খাঁ, জীতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতি লাল নেহেরু, মৌলানা মোহম্মদ আলি, ব্যোম কেশ চক্রবর্ত্তী, যোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, হাজি আব্দার রসিদ খাঁন, মৌলবী কাদের বক্স, মৌলবী মহিউদ্দীন খাঁ, মৌলবী নুরলহক চৌধুরী, বিপিন পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি, কে, লাহিড়ী, কামিনী কুমার চন্দ, হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ডাঃ প্রমথ বন্দোপাধ্যায়, সহিদ্ সুরাবর্দ্দি, অখিল চন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী, ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায়, ফন্তুদা, সুরেশ মজুমদার, আরো অনেকে নানা দিকে গ্রেপ্তার হলেন। এইসব আগেকার অনেক কথা ভাবতে ভাবতে খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়েছি।

রাত্রি একটায় মস্ত 'হল্লা' উঠল। যে যেখানে ছিল তাদের ছেলে মেয়ে নিয়ে আত্ম রক্ষায় ছুটে পালাল। কেউবা আবার বাঘ মারবার যন্ত্র-পাতি নিয়ে হট্‌পট্ শব্দে শিকারীর মত সদর্পে রুখে দাঁড়াল। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদের আনা গোনার তৎপরতা বেড়ে উঠল। ধনী লোকেরা নিজেদের বাড়ীর দ্বারবান বাড়ালেন। পাড়ার বেকার ছেলেদের নিয়ে তাঁদের আত্ম রক্ষার দল করলেন। মাঝে মাঝে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করতে লাগলেন।

দরিদ্র আমরা, এমনই অসহায় হয়ে পড়লুম যে, সর্ব্বদাই যেন 'ওয়ার ফিল্ডে' শত্রু সেনায় বেষ্টিত বলে মনে হতে লাগল। সমস্ত কাজ ছেড়ে শুধু হল্লা শোনা ও শাঁখ বাজানো ছাড়া আমাদের কারো করবার কিছু

ছিল না। যে যা গুজব ছড়াতো তাই বিশ্বাস করে নিতে হত। কেননা, তখন সমস্ত রকমের যোগাযোগ একেবারে বন্ধ।

দূরের আত্মীয় স্বজনদের জন্যে উদ্বেগে সকলের মন অস্থির হয়ে থাকত। ছেলে, বুড়ো, এমনকি মেয়েরা মিলে সর্ব্বদা খাড়া পাহারা। এইভাবে তিনদিন তিনরাত্রি কোথা দিয়ে কেটে গেল। একটুও ঘুমোবার অবসর ছিলনা। যদিইবা পাল্লা করে কেউ শুলুম। অমনি কানে আসছে শুধু হল্লা ও শাঁখের শব্দ। কান ও মনের এমনই অবস্থা হয়েছে যে, কান খুব খাড়া করে শুনলেও ঐ একই শব্দ কানে বাজতো। সব চেয়ে বেশী বিব্রত করত শিয়াল ও কুকুরের চীৎকার।

রোজ সন্ধ্যায় পাড়ার মোড়ে মোড়ে প্রহরার জমায়েত বসে। এখন যেন কার অলক্ষ্য আদেশে নৈশ প্রহরার অবৈতনিক চাকুরে আমরা। বাড়ী থেকে বেরিয়ে সকলের প্রথম কাজ কোন জমায়েতে গিয়ে বসা ও পরে সারা রাত্রি জাগবণ পাহারা। দেশের নেতাদের সমালোচনা যে জমায়েতে বেশী চলে সেই দলই সকলকে আকৃষ্ট করে বেশী। একটি জমায়েতে গিয়ে বসলুম।

আলোচনা শুনছি—ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় তাঁর সানুনয় আমন্ত্রণে গান্ধীজীকে যেদিন 'চিত্তরঞ্জন সেবা সদনের' ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে কলকাতায় আনলেন, সেদিনতো গান্ধীজীকে দেখবার জন্যে লোকে লোকারণ্য। তখনকার ফাঁকা কলকাতায় মহাত্মা দর্শন প্রার্থী জন সমুদ্রের সংখ্যা নির্নয় করা সকলের অনুমান শক্তিকেও ব্যর্থ করেছিল। গ্রাম ও গ্রামান্তর থেকে জনতার পর জনতা জোট্ বেঁধে কলকাতায় সার দিয়ে দাঁড়িয়ে। জাতি, ধর্ম্ম, বর্ন নির্ব্বিশেষে সবাই এসেছিলেন. মহাত্মাজীকে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। সে যেন এক বিশাল জন সমুদ্রের বিরাট মহোৎসব আমাদের জাতির ইতিহাসে এ একটি চিরস্মরনীয় ঘটনা। সেদিন মহাত্মা তাঁর বর্ক্তৃতায় জানালেন, 'আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ রাজনীতি বিদ্ নেতা পরলোক গত লালা লাজপত রায় ও দেশবন্ধু

চিত্তরঞ্জন দাশ, এঁদের সমস্ত জীবন জাতীয় সংগ্রামে নিয়োগ সত্ত্বেও কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে দান না দিয়ে, জনহিত কর দাতব্য স্বাস্থ্য শালায় সমস্ত সম্পত্তি দান করে গেলেন। তাই আমাদের উচিত অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠান-গুলি রক্ষা করা'। মহাত্মাজীর এরূপ ভাষণে জনসমুদ্র উল্লসিত হোল। এই বিষয়ে এত জনসমাগম দেখে তাই বলতে হয় যে, মহাত্মাজীর আন্দোলন গুলি দেশের আর কিছু না করুক ভারতের জাতি, ধর্ম্ম, বর্ন নির্ব্বিশেষে জন সংযোগ ঠিকই করেছে।

বেজু বললে, এত বড় একটা পঙ্গুজাতকে মানুষের অধিকার বুঝিয়ে দিতে গেলে কতযে কঠিন ধৈর্য্যের ও নিরভিমান কর্ম্মশক্তির প্রয়োজন হয় তা' এঁদের আন্দোলন কাজের বাইরে থেকে মোটেই অনুভব করা যায় না। এছাড়া কার্য্য সমাধার কৌশলের জন্যে যে সব কথা নেতাদের লেকচারে শুনি বা কাগজে বড় বড় ছাপার অক্ষরে দেখি, সেগুলির অন্তরালে আর একটি গোপন মত যে আন্দোলন-কারীদের মনের মধ্যে থাকতে পারে, তাই-বা অস্বীকার করি কি করে? গান্ধীজীর মধ্যে মহা মানবের কোন নিদর্শন না দেখেই কি অন্যান্য কয়েকটি দলের মত অথবা মাত্র হুজুগে পড়ে এযুগেরই পূর্ন মানব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধী-জীকে 'মহাত্মা' আখ্যায় ভূষিত করে নিজে তৃপ্ত হয়েছেন? মনি বললে, তুমি যাই-ই বল। প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলনের দানা বাঁধে 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলন থেকেই। এর সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী দল বৃটিশের নৃশংস ভাবে আন্দোলন দমনের অত্যাচারকে বন্ধ করবার তাগিদে গুপ্ত বিপ্লবী দলের আন্দোলনের সূচনা। সেই থেকে দৃঢ়চেতা সাহসী যুবকেরা গুপ্ত সংগঠনে যোগ দিতে থাকেন। এদের হাতিয়ার হয় বোমা ও পিস্তল। প্রতিভাবান যুবক যাদের ঘরে দৈনন্দিনের অভাব ছিলনা ও স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ তাঁরা কেউ কংগ্রেস দলে আর কেউবা গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন।

চির বিপ্লবী মানবেন্দ্র রায়ের সহকর্মী বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা মৃত্যুঞ্জয়ী

বীর বাঘা যতীন তাঁর পাচজন সঙ্গী নিযে 'স্বরাজ' সংগ্রাম পরিকল্পনায় বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। পাড়ি দিলেন বিপদ সঙ্কুল পাহাড় জঙ্গলের দিকে। পাহাড় জঙ্গলের সরু পথ ধরে যতীন মুখুয্যে, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন্দ্র ও যতীশ এই পাঁচজন পঞ্চ পাণ্ডবের মত বীর দর্পে আত্ম গোপন করে সংগ্রাম করতে বার হলেন। জার্মান থেকে মারণ অস্ত্র ভর্ত্তি জাহাজ আসবার আশায় নদী তীরে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ক্ষুধায়, অনিদ্রায়, দীর্ঘপথ শ্রমে ও রাত্রি জাগরণে সকলে অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন। তার ওপব এইভাবে বেশীদিন আত্ম-গোপন করে থাকা খুবই অসম্ভব হয়ে উঠল। পশ্চাতে ধাওয়া করেছে রক্তলোভী নেকড়ের দল। টেগার্ট সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে ক্রমে এঁদেব ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে এলো। তখন দু'পক্ষ থেকেই মুহু মুর্হু গুলি ছুটতে থাকল। রীতিমত যুদ্ধ। মৃত্যু ভয়হীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। বুড়ি বালামের তটভূমি রক্ত-রাঙ্গা হয়ে থাকল চিরকাল। তবু বৃটিশের নৃশংসতা হ্রাস পেল না। শুধু আমাদের কাছে চির স্মৃতি হয়ে রইল ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫ সাল।

এই ভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠায় ও দেশের কল্যাণ কামনায় যাঁরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন তাঁবা হ'লেন, মহারাষ্ট্রেব দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়, বাঘাযতীন, যতীন দাস, যোগেশ চাটুয্যে, ক্ষুদীরাম, দীনেশ মজুমদার, প্রফুল্ল চাকী, কানাই দত্ত, সত্যেন বসু, ভবানী ভট্টাচার্য্য, বটুকেশ্বর দত্ত, সন্তোষ মিত্র, স্মৃতিশ বাঁড়ুয্যে, মোহন সিং, ভগৎ সিং, সৃষ্টিধর সান্যাল, বসন্ত বিশ্বাস, আসফাক উল্লা, রাজেন লাহিড়ী, চন্দ্রশেখর আজাদ, আমীরচাঁদ, বিপ্লবী পিংলে, রাজ গুরু, সুখ দেব, মাষ্টারদা সূর্য্যসেন, আরো সহস্র সহস্র মৃত্যুঞ্জয়ী বীর ও মেয়েদের মধ্যে কল্পনা দত্ত, অনুজা সেন, শান্তি ঘোষ, লীলা দত্ত, পারুল মুখার্জ্জী, উজ্জ্বলা মজুমদার, সুনীতি চৌধুরী, প্রীতিলতা ওয়ার্দ্দার, পাঞ্জাবের ভোজেশ্বরী, তেজপুরের কনকলতা, মাতঙ্গনী হাজরা ও আসামের ১৩ বছরের

স্বর্নলতা আরো বহু বীরাঙ্গনা সকলে অকাতরে নানা ভাবে মৃত্যু দলিলে স্বাক্ষর রেখে গেলেন, এরকোন সংখ্যা নেই।

এই স্বাধীনতা আন্দোলনে তীতুমীরের বাঁশের কেল্লা থেকে শুরু করে এযুগেরই বিপ্লবপন্থী মানবেন্দ্র রায়, মহামান্য বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, বিপ্লবী লালা হরদয়াল, রাসবিহারী বোস, সর্দ্দার অজিৎ সিং, পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়, বীর সাভারকার, বিখ্যাত ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র, হেম কানুনগো, যোগীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুলিন দাস, মহেন্দ্র প্রতাপ, দেবব্রত বসু, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, ডাঃ ভূপেন দত্ত, বিপ্লবী পিংলে, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, উপেন ব্যানার্জ্জী, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, বরকতুল্লা, উপেন গাঙ্গুলী, বিপিন গাঙ্গুলী, ওবেদুল্লা সিন্ধি, সখারাম, সতীশ সামন্ত, অজয় মুখার্জ্জী, অরুণা আসফ আলি, অচ্যুত পট্টবর্দ্ধন, রাম মনোহর লোহিয়া, হেরম্ব গুপ্ত, রাহুল সংস্কৃত্যায়ণ ও বীরেন চাটুয্যে প্রভৃতি বিদ্রোহী বীর এবং এঁদের বীর সঙ্গীরা, তার সঙ্গে আরো অনেক দেশ প্রেমিক শক্তিমান সন্ত্রাসবাদী দল ভারতের মধ্যে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম পূর্ণ-উদ্যমে চালান।

এসব বিক্ষিপ্ত আন্দোলনে কি যেন এক প্রলয় সম্ভাবনায় সারা দেশ উন্মাদনায় কাঁপছে। নিরস্ত্র অসহায় নির্ব্বাক মানব গোষ্ঠী এখন কি এক যাদুমন্ত্র শক্তিতে কথা বলতে শিখে গেছে। উদ্ধত দুর্ব্বিনীত কণ্ঠে স্বাধীকারের দাবী নিয়ে ভারতবর্ষ মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তার ভয়, শঙ্কা, সন্ত্রাস চারিদিকথেকে ধুমায়িত। ঠিক এই দুঃসময়ের মাঝে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং বলতে গেলে দৈনন্দিন সমগ্র জীবন সমস্যার সামনে এগিয়ে এসে, অভয়দানের সঙ্গে লাঠি নিয়ে দাঁড়ালেন গান্ধীজী। গান্ধীজীর স্পর্শে এসবের মোড় ঘুরল। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সমগ্র ভারতের সুপ্ত বিদ্রোহকে জাগিয়ে তুললো এবং অখণ্ড রাষ্ট্র চেতনায় বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে ঐক্য চিন্তায় গেঁথে ফেললেন গান্ধীজী।

গান্ধীজী মুষ্টিমেয় উচ্চ শ্রেণীর মানুষের পলিটিক্‌স্‌কে বৈঠক খানার টেবিলের যুক্তি তর্ক ও সলা-মরামর্শের বন্দীশালা থেকে সবাইকে মুক্ত করে নিয়ে, নিজে গেলেন মাঠে, ময়দানে জনতার মধ্যে। এর ফলেই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ক্রমশঃ সোচ্চার হয়ে উঠল। সারা ভারত, হিমালয় থেকে পশ্চিমে আরব সাগর তামাম্‌ হিন্দুস্থান ক্রুদ্ধ সমুদ্রের মত গর্জ্জন করে উঠল। ভারত ভূমি থেকে এই শয়তানী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমূলে অবসান চাই।

১৯৩০ সালেই আবার সারা বাংলায় সশস্ত্র বিদ্রোহের দাবিগ্নি ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকায় বিনয়, বাদল দীনেশের পিস্তল থেকে আগুণ ঠিক্‌রে বার হয়। বাংলার ইনস্পেক্টার জেনারেল অফ পুলিশ মিঃ এফ, জে, লোম্যান ও অন্যজন ঢাকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ অফ পুলিশ কুখ্যাত মিঃ ই, হড্‌সন্‌ দু'জনেই গুলির আঘাতে ভু-লুণ্ঠিত হলেন। এর পরই সারা দেশময় হুলুস্থুল। ব্যাপক ধড়পাকড় ও খানা তল্লাসী।

বিনয়, বাদল. দীনেশ নানা দু.খ কষ্টের মধ্য দিয়ে ছদ্মবেশে তাদের নেতৃবৃন্দের সজাগ পাহারার সহায়তায় একেবারে কলকাতায় এসে হাজির। তখনও এই তরুণদের রক্ত ঠাণ্ডা হয়নি।

৯ই ডিসেম্বর (১৯৩০) কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ঢুকে বাংলার কারা বিভাগের ইনস্পেক্টার জেনারেল লেফট্‌ন্যাণ্ট কর্নেল সিম্‌সনকেও গুলির আঘাতে তৎক্ষণাৎ ভু-লুণ্ঠিত করলে। বাংলার তরুণ বীর বিনয় (২২) বাদল (১৮) দীনেশ (২০)। এই সিম্‌সন্‌ই জেলের মধ্যে নেতাজীকে প্রহার করেছিলেন। এইসব বাঙ্গালী তরুণ বীরদের প্রতিশোধের জোরে ইংরেজ সরকার সেদিন যেমন ভয়ে থর থর কম্পবান। তেমনি ইংরেজদের সন্ত্রাস দেখে বাংলা তথা সারা ভারতের তরুণ দল মহাতৃপ্ত ও আনন্দে উল্লসিত।

সপ্তম পর্ব্ব

গান্ধীজীর রাজনীতি ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

আজকের রাত্রের প্রহরা ঘাঁটিতে আমার কিছু বলার পালা। তাই শেষ রাত্রির দিকে আমি কিছু বলতে আরম্ভ করলুম।

ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে নেতৃবৃন্দের দলাদলি ও মতদ্বৈধতা অনেক সময় আমাদের মনস্তুষ্টির জন্যেই করতে হয়েছে। কেননা, আমাদের মন সর্ব্বদা দ্বন্দ্বপ্রয়াসী ও অনুদার। তাই আমরা ভাল কিছু শোনার চেয়ে কারো নিন্দে ও মিথ্যে অপবাদ শুনতে বেশী ভালবাসি। ভালবাসি আমরা নিজের দোষ ঢেকে অপরকে দোষী করতে। আমাদের এই রুচি ও মনোভাবকে বজায় না রেখে আমাদের দলে মিশ্‌তে এলে আমরা তাঁদের নিজেদের আত্মীয় রূপে গ্রহণ করতে পারব না। তাই মহাত্মাজীকে অনেক বিষয়ে বার বার অভিনয়ের পর অভিনয় করে আমাদের ভাল ও মন্দ বিষয়ে ধীরে ধীরে শেখাতে হয়েছে। শেখাতে হয়েছে, মানুষ মানুষকে অবজ্ঞা না করে হাসি মুখে করজোড়ে পরস্পরকে সম্মান জানিয়ে কথা বলতে।

একটি অভিনয়ের কথা বলছি। সেটি হোল ১৯২৩-২৪ সালে ভারত কাউন্সিলে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা। নবগঠিত 'স্বরাজ্য দল' ভবিষ্যত দল পুষ্টির আশায় সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে রাজনীতিজ্ঞের সংখ্যা বাড়াতে কাউন্সিল প্রবেশ অধিকার দিতে দৃঢ় সংকল্প হ'লেন। এই সিদ্ধান্তে কংগ্রেসের সম্মতি আছে দেখে, মহাত্মাজী উত্তেজিতের ভাণ করে, এক রকম রুষ্ট চিত্তেই বললেন, 'কংগ্রেস কর্ম্মীরা যদি গঠন মূলক কর্ম্ম তালিকা বিস্মৃত হয়ে মাত্র কাউন্সিল ও এ্যাসেম্ব্লির ব্যর্থ বিতর্কে নিজেদের কর্ম্ম

শক্তি নিবদ্ধ রাখেন, তা'হ'লে অচিরেই তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন যে, রাজনীতির যা' প্রাণ পদার্থ তা' আমি নিজের সঙ্গেই নিয়ে যাচ্ছি এবং তাঁরা নিজেদের জন্যে যা' রাখছেন তা' বাইরের খোসা মাত্র। মানবতা বা জীবনি শক্তির ছিটে ফোঁটাও তাতে নেই।'

মহাত্মাজী লোকচক্ষে রাজনীতি থেকে পুরা পুরি অবসর নিয়ে রুষ্ট চিত্তেই বিশ্রামের জন্যে সবরমতী আশ্রমে ফিরে যাচ্ছেন। মৌন ভাবে নয়, অনশন করতেও নয়, কর্ম্মীদের ওপর শুধু বীতরাগ। সঙ্গে যাচ্ছেন দেশমাতা কস্তুরবা গান্ধী ও ধর্ম্মপ্রাণা শিষ্যা মীরাবেন। দেশের আমরা সকলে ভাবছি, কংগ্রেসের মধ্যে একি ওলোট্-পালোট্। জনসাধারণ কেমন যেন সমস্যায় পড়লেন। সকলের দৃষ্টি পড়ল সবরমতী আশ্রমের দিকে।

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, কংগ্রেস থেকে মহাত্মাজীর পুরা পুরি অবসরেও তবু তাঁর কাজের যেন বিরাম নেই। রাত্রি ৩ টায় শয্যা ত্যাগ ভোর চারটা অবধি লেখার কাজ, পরে প্রার্থনা। প্রার্থনার পর দুধ ও ফল ভোজন। এরপর আবার লেখা। কাজ না থাকলে সকালে বেড়ান। বেলা সাড়েদশটা পর্য্যন্ত আগন্তুকদের সঙ্গে পরামর্শ ও আলোচনা। এর পর স্নানের ঘরে গরম ঠাণ্ডা জলে স্নান। পরে দুধ, ফল ও লবন হীন শাক সব্জীর তরকারী খান। খাওয়ার পর কিছুক্ষণ আবার দেখা সাক্ষাতের পালা। বেলা পাঁচটায় ফল আহার। এর পর প্রয়োজনীয় কাজ। সন্ধ্যা সাতটায় উপাসনা। তারপর আবার কাজ। রাত্রি দশটার পর নিদ্রা।

পরবর্ত্তী কালে মহাত্মাজী পুনরায় কংগ্রেসে যোগদানের পর আরো একটি বিষয়ে লক্ষ্য করা গেল সেটি হল ১৯৩২ সালে কংগ্রেস আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের পর রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রথম অধিবেশন। যমুনা লাল বাজাজের প্রস্তাবে ও ডাঃ আন্সারীর সমর্থনে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য সভাপতির আসনে উপবিষ্ট। দুইশত সদস্য ও বিশিষ্ট দর্শক সংখ্যা ছিল ন্যুন পক্ষে দুই হাজার।

মঞ্চে ছিলেন সরোজিনী নাইডু, অনুসূয়াবেন, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, বাবুরাজেন্দ্র প্রসাদ, ডাঃ আন্সারী, ভুলাভাই দেশাই, মিস্ হ্যারিসন্, মিস মুরিয়েল লিষ্টার, কমলা নেহেরু, উমা নেহেরু, মিঃ শেরওয়ানী, মৌলবী আহম্মদ সৈয়দ, নরী ম্যান, মিঃ আনে, ডাঃ সফিউদ্দিন, ডাঃ কিচলু প্রভৃতি।

কার্য্যারম্ভেই গান্ধীজী বলেন, আমারই পরামর্শে কংগ্রেস কর্ম্মীগণ ১৯২০ সালে আইন সভা বর্জন করেন। এতে নাকি দেশের অনেক স্বার্থহানি করা হয়েছে, এমন কথাও অনেকে বলেছেন। আমি কিন্তু তা' মনে করিনা। 'পূণা বৈঠকের' পর কারো কারো ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, কোন কোন কংগ্রেস কর্ম্মী আইন সভায় প্রবেশ করতে ইচ্ছুক। তাই তাঁদের আইন সভায় প্রবেশ করতে দেওয়াই সঙ্গত।

মিঃ এম, এস, আনে প্রস্তাবটি সমর্থন করে বলেন, মহাত্মা গান্ধীজীই কাউন্সিল 'বয়কটে'র জন্ম দিয়েছিলেন। আবার ইনিই আজ কাউন্সিলে প্রবেশের প্রস্তাব করছেন।

শ্রীযুত অভয়ঙ্কর বলেন, কাউন্সিল প্রবেশের প্রশ্ন আজ আমাদের নতুন নয়। স্বামী কুমারানন্দ বলেন, লাহোর কংগ্রেসের প্রশ্ন বাতিল করতে পারেন না। মিঃ শেরওয়ানী বলেন, রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে সত্যাগ্রহ অবলম্বিত। কারণ ধর্ম্মনীতির মূলে শুধু বিশ্বাস আর রাজনীতির মূলে থাকে শুধু অবিশ্বাস। এসব মতান্তরে মনেহয় গান্ধীজী কি ইংরাজ বনিকদের এজেণ্ট? অধ্যাপক ইন্দ্র বলেন, মহাত্মাজীর প্রস্তাব আমি সমর্থন করি।

মিঃ আবিদালি বলেন, মহাত্মা গান্ধী যাবেন জেলে, আর ডাঃ আন্সারী যাবেন কাউন্সিলে, একি রকম হবে। গান্ধীজী হেসে বলেন, ডাক্তার আন্সারী নিশ্চয় আমাকে জেলমুক্ত করবেন। অতঃপর রাত্রি আটটা চল্লিশ মিনিটের সময় ডাক্তার আন্সারী সবের প্রত্যুত্তর দিতে উঠে বলেন, 'মহাত্মা গান্ধীজী আমাদের সেনাপতি। তাঁর আদেশ উপেক্ষা করা কারো

উচিত নয়। সংগ্রামের ধারা নির্নয়ের দায়িত্ব একমাত্র সেনাপতির, সৈন্য-দের নয়'। ডাক্তার আন্সারীর এ প্রস্তাবটি আজ ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন বলে অভিহিত করায়ায়।

কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা গেছে, কাউন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধ মত সকলের প্রবল থাকা সত্বেও, শুধু মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই' কাউন্সিল প্রবেশ-কারীগণ কংগ্রেসের সমর্থন লাভে কৃতকার্য্য হয়েছেন। মহাত্মাজীর এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতার মূলে কিন্তু, পরমেশ্বরে সত্যিকারের জীবন্ত বিশ্বাস। তিনি নাকি বিশ্বাস করতেন যে, সময় পূর্ন হলে স্থিরচিত্ত চিন্তাশীল মানুষেরা, ঈশ্বরের অনুজ্ঞায় কর্ত্তব্য পথ আপনা হতেই জানতে পারেন।

তাই মনে হচ্ছে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের যথাক্রমে শিষ্য যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, সুভাষ চন্দ্র বসু, খাজা নাজিমুদ্দিন ও সহিদ্ সুরাবর্দ্দির কথা। কিন্তু এঁরাও দৈব নির্ভর শীল ছিলেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন তাঁর কোষ্ঠীতে 'হূনীভার্য্যা ভবিষ্যতি' দেখে কোষ্ঠীকার জ্যোতিষীকে প্রশ্ন করেন যে, এর অর্থ কি? যোতিষী বলেন, পূর্ব্ব জন্মে আপনি কোন রমনীর মনঃ কষ্টের কারণ হওয়ায়, এ জন্মে তিনি শ্বেতদ্বীপে হূণ বংশ জাতপর বয়ঃ-প্রাপ্তে গান্ধর্ব মতে আপনার সঙ্গেই বিবাহ হবে। বাস্তবিকই দৈবের ঘটনা পতিপ্রানা নেলী সেনগুপ্তার সঙ্গে যতীন্দ্র মোহনের বিবাহ হওয়ায় তাঁর অদৃষ্ট বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

আর এক ঘটনা। দেশপ্রিয় যখন কলকাতা করপোরেশনে মেয়র পদে অধিষ্ঠিত তখন নির্ব্বাচনের সময় তাঁর প্রিয় অনুচরদের জোর গলায় ফরাসী বীর নেপোলিয়ানের মতই বললেন, 'গ্রহ আমার সুপ্রসন্ন আমাকে হারায়কে?' সত্যিই দেখাগেল চতুর্থবার মেয়র পদে নির্ব্বাচন হওয়ার পর পঞ্চমবারের নির্ব্বাচন অতিশয় সংশয়াপন্ন ছিল। কিন্তু গ্রহ প্রসন্ন থাকায় অতি আশ্চর্য্য ভাবে তাঁর জয়লাভ হয়। এমনকি অনেকেই জানেন, তাঁর প্রিয় বন্ধু সহকর্ম্মী সুভাষ বাবুকে মেয়র পদে নির্ব্বাচিত হবার সুযোগ দিতে যতীন্দ্র মোহন উক্ত প্রার্থীপদ হতে সরে দাঁড়ান।

স্বামী বিবেকানন্দ ও সিষ্টার নিবেদিতার মত যতীন্দ্র মোহন ও নেলী সেনগুপ্তা দেশের অশিক্ষিত লোকদের নিন্দাবাদ হজম করেও দেশের অনেক সেবা করেছেন। দেশ সেবা ও স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাতে তাঁদের শিক্ষিত যুবক ও যুবতীর সু-সংবদ্ধ একটি সংস্থা ছিল। এই সংস্থা 'বঙ্গীয় জাতীয় বাহিনী' নাম দিয়ে দেশের ছোট বড় অনেক রকম কল্যান মূলক কাজ করেছেন সন্দেহ নেই।

১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ সালে মাষ্টারদা সূর্য্য সেনের সহসা 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার। অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, প্রীতি ওয়ার্দ্দার, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল প্রভৃতি বিপ্লবী যোদ্ধাদের অসীম সাহস ও অদ্ভুত যুদ্ধ কৌশলে মাত্র সাত সেকেণ্ডের মধ্যে অস্ত্রাগার হস্তগত, মূহুর্ত্ত মধ্যেই টেলিফোন ও ট্রেজারী করায়ত্ব করেন। এই চমকপ্রদ যুদ্ধ জয়ে ব্রিটিশের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে। বৃটিশের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ ও দু'চারদিনের জন্য স্বাধীনতা রক্ষা করা একটা তুচ্ছ বিষয় নয়। এর ঘটনাও কম ঘটেনি। সে সব এই অল্প পরিসরের বইয়ে বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। তবে আমাদের দুঃখ এই যে, এতবড় দেশপ্রেমিক নির্ভীক কৌশলী যোদ্ধা ও যুদ্ধজয়ী বিপ্লবী মাষ্টারদা সূর্য্যসেনকে ধরে নিয়ে গিয়ে ব্রিটিশ অম্লান বদনে জেলের মধ্যে ফাঁসি দিলেন ১২ই জানুয়ারী ১৯৩৪। নিয়তির কি অদ্ভুত পরিহাস।

গুজব আছে যে, এঁদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে উৎসাহ যুগিয়ে ছিলেন নেলী সেন গুপ্তা, বিপিন গাঙ্গুলী ও তুলসী গোঁসাই প্রভৃতি। এরও পেছনে লক্ষ্য করলে দূরে নাকি অস্পষ্ট-ছায়া মূর্ত্তির মত একজন শান্তি-কামী বিরাট পুরুষ চট্টগ্রাম বাসীকে দেখতে পাওয়া যায়। যিনি নাকি এর ভেতরে ভেতরে ছিলেন মূলাধার। ইনিই আমাদের দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত। আলোচনা শেষ করে বেলা বাড়ছে দেখে বাড়ী ফিরে এলুম।

দূরে এক 'হল্লা' শুনতে পাওয়া গেল। পাড়ায় মস্ত হৈ-চৈ কোলাহল

উঠলো। আমরা সকলে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালুম। রাস্তায় তখন প্রায় সব লোকই লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। খুব তোড় জোড়ের সঙ্গে ছুড়্ দাড়্ শব্দে একদল লোক ছুটে আসার পায়ের শব্দ পাচ্ছি। আমরা খুব মরিয়া হয়ে একসঙ্গে রাস্তা রুখে দাঁড়ালুম। পরক্ষণেই দেখলুম যে গাড়ী টানা ঘোড়া ছুট্‌ছে আর তার পেছনে ছেলের দল উল্লাস করছে। হাসতে হাসতে লাঠি রেখে বাইরে রাস্তার ধারে পোলে এসে বসলুম।

বসে আছি, প্রতিবেশী এক দল মুসলিম ভায়েদের সঙ্গে দেখা। তার অধিকাংশই ছিল আমার অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয়ের শ্রমিক ছাত্র। এদের নিয়ে ঘর খুলে বসলুম। এরা আমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে আসার দুরাবস্থা দেখে সকলে দুঃখ জানিয়ে বললে, 'যত সব গুণ্ডা, বদ্‌মাস, মফলিস্ লোকেরা এসব হাঙ্গামা নিজেরা ইচ্ছে করেই করছে। অথচ সব দোষ হচ্ছে জিন্না সাহেবের। এদের মত সমর্থন করে বললুম, তা' ঠিক। এই জিন্না সাহেবই এক সময় জাতীয় কংগ্রেসের বড় মাতব্বর ছিলেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তবে এত দলাদলি, রেষারেষি, রক্তা-রক্তি কেন? এক কথায় জবাব দিতে গেলে বলতে হয় যে, নিশ্চয় এর আজ কোন প্রয়োজন আছে, যা' আমরা এখন বুঝতে পারছি না। তবে লীগ, কংগ্রেস ও দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলে যতই রেষারেষি চলুক না কেন, এসব গুলিই কিন্তু আমার চোখে রাজনৈতিক অভিনয় বলে মনে হয়। আমিতো দেখি, মহাত্মাজী যেন স্বাধীনতা সংগ্রামের একাধারে নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক এবং আর সব নেতৃবৃন্দ যেন অভিজ্ঞ নট্-নটী। ঘড়িতে একটা বাজলো দেখে আলোচনা বন্ধ রেখে সকলে যে যার কাজে চলে গেলুম।

নবম পর্ব্ব

লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক

মহাষ্টমীর পূজো দেখে ছেলে মেয়েদের নিয়ে বাড়ী ফিরতে ফিরতে মহিষাসুরমর্দ্দিনী দুর্গা মাতার স্বরূপ কিছুটা ব্যাখ্যা করলুম। বললুম যে, অন্যায়কে পরিহার করতে হলে, অন্যায়কারীকেও নিধন করতে হয়। আমাদের মা দুর্গা একদিকে যেমন তাঁর সমাজ কল্যানী রূপ, অপর দিকে তেমন অসুর দলনীরূপ কেমন করে ধরে ছিলেন, তারই চরম নিদর্শন হ'চ্ছে দশ প্রহরণ ধারিনী মহামায়ার আরাধনা এই 'দুর্গা পূজা'।

যখন বাড়ী ফিরলুম, তখন রাত্রি একটা। হিন্দু ও মুসলিম সকল পাড়ার প্রহরা ঘাঁটিতে উভয় দলই সজাগ পাহারায়। তা'হলেও আজ প্রতিবেশী সকলেই আনন্দে মুখর। পূজোর ক'দিন খুবই আনন্দে কাটছে। কোথাও কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর নেই। হিন্দুদের মত মুসলমানদের 'ঈদ্ মোবারক' পর্ব্বটি বেশ শান্তিতেই কেটেছে। হিন্দু ও মুসলমানদের এ দুই মহাপার্ব্বন সারা ভারতে আগের মতই শঙ্কাহীন ও অবাধ আনন্দেই পালিত হয়েছে। ঈদের দিনে মুসলিমরা হিন্দুদের ভাই বলে জড়িয়ে ধরে যেমন 'প্রীতির অভিনন্দন' জানাতে আতর, গোলাপ জল গায়ে মাথায় ছড়িয়ে বুকে বুক দিয়ে মিলেছেন, তেমন হিন্দুরা অনেক মুসলিম ভাইদের হাতে 'রাখী বন্ধন' করে আপন করে নিয়েছেন। এবং বিজয়া দশমীতে মিষ্টির পর মিষ্টি প্রদানে হিন্দু মুসলিম সকলে মিলে কোলাকুলির মাধ্যমে আনন্দ উৎসব করবেন। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুই বৃহৎ সম্প্রদায় গান্ধী-জিন্নার যুক্ত বিজ্ঞপ্তির অনুরোধ সকলে ঠিকই রক্ষা করলেন। তাই উপরোক্ত মহা পর্ব্বদিন দু'টি হিন্দু-মুসলিম মিলে

সত্যিই বেশ সুন্দর ভাবে মধুময় করে তুললেন।

এরকম মহা পর্ব্বদিনের স্বর্গীয় আনন্দ আমরা রোজই পেতে পারতুম। যদি আমরা সকলে নিজেদের এক বংশজাত বৃহত সংসারের মানুষ মনে করে, একমাত্র শক্তিমান ঈশ্বরের এক নিষ্ঠ পূজারী হতুম ও আত্মাকে সৎ করার চেষ্টা করতুম। কিন্তু আমাদের ভেতর সে মহতী সৎ চিন্তা নেই, মানব চেতনার সরল জ্ঞান বাড়ানোর সৎচর্চ্চা নেই, তাই ধর্ম্মের অবোধ্য মন্ত্র শুনিয়ে, ভগবানের দোহাই দিয়ে ধর্ম্মের নামে আমরা নিজেদের মধ্যে করছি দাঙ্গা, আবার রক্তারক্তি, আবার মানুষ মারবার নব নব আয়োজন। জিগির তুলছি 'নারায়ে তক্‌বীর' আল্লা হো আকবর।

আমাদের প্রহরা ঘাঁটিতে ঢুকে দেখি, সকলে বসে আলোচনা করছে, 'লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক'। এই বৈঠকে ভারতের ভাবী শাসন তন্ত্র স্থিরী কৃত হবে। সরকার নিয়ে যাচ্ছেন ভারতের নেতৃবৃন্দকে। এই দ্বিতীয় গোলটেবিল আহুত হয় ৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৩১)। এতে ১৭০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের নামকরা অনেক নেতা ও নেত্রী গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করলেও কংগ্রেসেব প্রতিনিধি রূপে ছিলেন গান্ধীজী।

মৌলানা মোহম্মদ আলি সাহেব যখন লণ্ডন রওনা হন, তখন হিন্দুদের মধ্যে অনেকে বললেন, কংগ্রেসের এই মোহম্মদ আলি মুসলিম মহা নেতা হয়ে গিয়ে হিন্দু বিপক্ষে এমন একটি অভিযোগের দাবী তুলে বসবেন, যাতে করে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নষ্ট হয়ে হিন্দু মুসলিম বিরোধের ভাব প্রকট হবে ও কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য অসাম্প্রদায়িক শাসন তন্ত্র রচনা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। এ ধারণার কারণ হোল, এসময় লাটসাহেবদের সঙ্গে মোহম্মদ আলির অতিরিক্ত ভাবে মেলা মেশি বেশ বেড়ে উঠেছিল। এর পরে যেদিন সংবাদ পত্রে বড় বড় অক্ষরে দেখাগেল যে, মোহম্মদ আলি সম্প্রদায় গত ভাবে ভারতের শাসন তন্ত্র রচনার বিরো -ধীতা করে গোলটেবিল বৈঠকে সিংহ বিক্রমে জীবন পণ করে ভারতের

পূর্ন স্বাধীনতার জোরাল দাবী জানিয়েছেন, সেদিন এই সব হিন্দুর চোখেই আনন্দাশ্রু ফুটে উঠেছিল। আবার তাঁর নাটকীয় ভাবে মৃত্যুতে প্রতিটি হিন্দু-মুসলমানের মন বিষাদ কালিমায় ভরে উঠেছিল।

সেই থেকে হিন্দুরা মহানেতা মৌলানা মোহম্মদ আলি ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দুই অমর আত্মাকে অভিন্ন মহান আত্মারূপেই শ্রদ্ধার আসনে চির-স্মরনীয় করে রেখেছেন। তাঁরা ছিলেন জাতিয়তাবাদী উদার মহা-নেতা। যেন একবৃন্তে ফোটা দুটি ফুল। এই মৌলানা মোহম্মদ আলির স্মৃতি স্মরনীয় করার মানসে কলকাতার বুকে মোহম্মদ 'আলি-পার্ক' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই মৌলানা মোহম্মদ আলি ১৯২৩ সালে 'কোকনদে' বার্ষিক কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি হয়েছিলেন।

সম্প্রতি যুগান্তর পত্রিকায় ১১ই ডিসেম্বর ১৯৭৮ সালে প্রকাশ, নয়া-দিল্লী ১০ই ডিসেম্বর (পি, টি, আই) জানাচ্ছেন। বর্ত্তমান ভারতের প্রধান -মন্ত্রী একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী মোরারজীভাই দেশাই আজ তাঁর বাসভবনে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী মোহম্মদ আলি ও জহরের সম্মানে একটি স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ করেন। হিন্দু মুসলিম ঐক্যের এবং দেশের পরাধীনতা ঘুচাতে মোহম্মদ আলির বিশিষ্ট ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি সভায় ভাষন দেন।

গোলটেবিল বৈঠকে বৃটিশ সরকার গান্ধীজীর প্রস্তাব উপেক্ষা করে তাঁদের ক্ষমতামত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গত ভাবে ভারতের স্বায়ত্ত শাসনের বিভিন্ন খষড়া যখন প্রস্তুত করতে চাইলেন, তখন মিঃ জিন্না তাঁর চৌদ্দ দফা দাবীর একটি লম্বা ফিরিস্তি পেশ করে, ঐখানেই গোলটেবিলের সমাপ্তি ঘটিয়ে দেন। এরপর ভারতের সকল নেতৃবৃন্দ ক্ষুন্ন মনে দেশে ফিরে আসেন, ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৩১)।

এদিকে গান্ধী-আরউইন চুক্তির দেড়মাস পরে আরউইনের কার্য্যকাল শেষ হয়। এঁরস্থলে লর্ডউইলিংডন ভারতে বড়লাট হয়ে এলেন (১৯৩১-১৯৩৫)। উইলিংডন ভারতে এসেই গান্ধী-আরউইন চুক্তি ভঙ্গ করলেন।

কংগ্রেসের ওপর উৎপীড়ন শুরু করলেন। হিজলী জেলে গুলি চালানো হোল। জেলে মেয়েদের ওপর নানা অত্যাচার শুরু হল। এইভাবে দিনের পর দিন ভারতে ব্রিটিশের উৎপীড়ন চলতে থাকে। এমন সময় লণ্ডনে অবস্থিত কৃষ্ণ মেননের প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়া লীগের' কয়েকজন প্রতিনিধি ভারতে আসেন. তাঁদের মধ্যে ভারতের পরিস্থিতির ওপর ভূমিকা লেখেন জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক বারট্রাণ্ড রাসেল। তিনি মন্তব্য করেন যে, 'জার্ম্মানীতে নৎসীরা যে অত্যাচার চালাচ্ছেন তা'তে বৃটেনের অধিবাসীরা ক্ষুব্ধ। কিন্তু বৃটেনরা জানেনা যে, ইংরাজ শাসকেরা ভারত বাসীদের ওপর একই ধরনের নিগ্রহ ও উৎপীড়ন করে চলেছেন।' এটি কাগজে প্রকাশ পেল।

এদিকে লর্ড উইলিংডন ভারতের প্রায় এক লক্ষ নব্বুই হাজার কংগ্রেস কর্ম্মীকে জেলে পুরেছেন। জেলের মধ্যে রাজবন্দীদের ওপর অবাধে অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছেন। কংগ্রেসের বিভিন্ন সংস্থার টাকা, পয়সা সব বাজেয়াপ্ত করেছেন। কংগ্রেসের সমর্থক ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের বিষয় সম্পত্তি সরকার দখল করে নিচ্ছেন। কংগ্রেসকে সম্পুর্ন নিশ্চিহ্ন করার সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন।

তৎসত্ত্বেও ভারত নেতারা বড়লাট উইলিংডনের এত অত্যাচারেও একটুও দমলেন না। বরং সকল রকম নতুন অভিজ্ঞতায় দেশনেতাদের স্বাধীনতার চিন্তা আরো প্রবল হল। তাই স্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্য এক রেখে একের অপর বিরোধীদল বাড়িয়ে, দেশের স্বাধীনতা কামী অভিজ্ঞ দেশ-কর্ম্মীদের ভাগা ভাগি করে বিরোধী দলে ছিটিয়ে, তাদের দিয়ে দলের বিরোধীতার মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলন অনির্ব্বান করে রাখা আরো জোরদার করলেন।

আবার অন্য দিকে দুই জাতির মর্জ্জাগত ধর্ম্মান্ধতা ও জাতির অস্পৃশ্যতা মনোভাব দুরীকরণের কঠিন কার্য্যভার নিলেন মহাত্মা গান্ধী ও জিন্না সাহেব। গান্ধীজী ও জিন্না সাহেব এঁরা দুজনে ধর্ম্ম সংস্কারকের রূপ ধরে, ধর্ম্মযাজকদের হস্তগত করে দ্রুত গতিতেই এগিয়ে চললেন, দেশে নির্ম্মল

সমাজ গঠন করে জাতির ভিত্তি দৃঢ় করতে।

গান্ধীজী বললেন, আমি সেই ভারতবর্ষ দেখতে চাই, যে ভারতবর্ষে কোন জাতির মধ্যে উঁচু নিচু বলে কোন শ্রেনী থাকবে না। ভারতবর্ষে সকল সম্প্রদায় পরস্পর অবাধে' সমান মর্য্যাদায় মিশবে। নারী, পুরুষ সকলেই যেদিন সমান অধিকার ভোগ করবে, সেই দিনই হবে আমার ধ্যানের ভারতবর্ষ।

মহাত্মার অনুগামী জিন্না সাহেবও কার্যভার নিলেন। বিভিন্ন মতাবলম্বি মুসলিম বহুদিনকার শাসন শোষনে যাঁরা স্বাধীনতার স্বাদ ভুলে গেছেন ধর্ম্মের নামে শুধু জাতি বিদ্বেষ ও মাত্র গোঁয়ার্ত্তুমী যাঁরা পালন করে চলেছেন তাঁদের মনে নব চেতনার সঞ্চার করে, রাজনীতি দীক্ষার সঙ্গে ভ্রাতৃ বিরোধ ভাবকে চিরতরে নষ্ট করে দেবেন। এইভাবে দু'জনে দুই জাতির জ্ঞান চক্ষুরূপে ভারতের ভাগ্যাকাশে উদয় হলেন। একজন হলেন সূর্য্য ও অন্যজন হলেন চন্দ্র এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপগ্রহের মত এঁদেব সহকর্ম্মী রূপে পাশে পাশে বিরাজ করতে লাগলেন। এই ভাবে লীগ ও কংগ্রেসের দল পুষ্টি ও জাতির মধ্যে নতুন প্রান শক্তির সঞ্চার হতে লাগল। কিন্তু আমরা রাজনীতিতে এতই অজ্ঞ যে, গান্ধী জিন্নার এরূপ উন্নত ধরনের কার্য্যভার গ্রহনেব গোপন রহস্য আজো সম্যক বুঝে উঠতে পারিনি তাই আজও তাঁদের দু'জনকেই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের দালাল বলে আখ্যা দিয়ে থাকি।

কিন্তু এঁরা আমাদের নিন্দা বাদকে তুচ্ছ করে, স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য এঁদের সৃষ্ট ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দলগুলিকে, রাজনীতিব পবামর্শ দেন এবং দায়িত্বশীল, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক বিশ্বাসী কর্ম্মী অন্বেসন করে, তাঁদের এক একদিকে দিকপাল নেতা তৈরী করতে থাকেন। এই সঙ্গে দেশের মধ্যে মাঝে মাঝে এক এক ধরনের আন্দোলন বা দাঙ্গার হিড়িক তুলে সর্ব্বজাতির মধ্যে নব জাগরনের স্রোত বইয়ে কু-সংস্কারাচ্ছন্ন ও শুচি বাইগ্রস্থ সমাজকে সংস্কার করে নতুন জাতির নতুন

মেরুদণ্ড গঠনে সাহায্য করতে থাকেন।

গান্ধীজীকে লক্ষ্য করে সুভাষ বাবু বললেন, 'ভারতের জনগণ বাপুজীর নিকট হতে দু'টি জিনিষ লাভ করেছেন। সেটি হল জাতির আত্ম মর্য্যাদা ও জাতির গঠন শক্তি, যার ক্ষমতা অতি প্রচণ্ড। গান্ধীজী যেমন আদর্শবাদী ও দুঃসাহসী তেমন অতি মাত্রায় সাবধানী বিপ্লবী'।

এদিকে জনগণের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাতে সাহায্য করেছে, অক্লান্ত দেশ-কর্ম্মী জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর 'ল্যাণ্টার্ন লেকচার', বিদ্রোহী কবি নজরুল ইস্‌লামের গান ও কবিতা, যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক বানী, রজনীকান্ত সেনের গীতিকাব্য, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কোরাস গান, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকাব্য, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চাটুয্যের 'বন্দেমাতরম্‌' বানী, প্যারী চাঁদ মিত্রের ও শরৎ চাটুয্যের সমাজ বর্ননা, এ, সি, চ্যাটার্জ্জী ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর প্রায়ই দলাদলি, মডারেট্‌ নেতা মাপ্রু ও জয়াকরের দম্ভাভিনয়, মুকুন্দ দাসের যাত্রাভিনয়, সর্ব্বোপরি মহাত্মাজীর দৈনিক রাজনৈতিক প্রাথনা সভা দেশ ও জাতি গঠনে অনেক সাহায্য করেছে।

আমাদের জাতীয় আন্দোলনে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেনীর ভূমিকাও খুব গুরুত্ব-পূর্ন ছিল। কারণ হিন্দু-মুসলমানের ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়েও কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায় একযোগে দেশের কাজ করে যাওয়ায়, হিন্দু-মুসলমানে মিলন যে সম্ভব তা' এঁরাই উজ্জ্বল ভাবে প্রমান করেছেন।

১৯৩২-৩৩ সালে আবার স্বদেশী আন্দোলন জোরদার করা হল, যাকে বলে **Personal Disobedience Movement.** এই আন্দোলনের মুখপাতেই বৃটিশ সরকার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলেন সারা দেশব্যাপী ধরপাকড়। তখন বোম্বাইয়ে 'মোদী ভবনে' কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর জোরদার মিটিং। জহরলাল তৎপর রওনা হলেন বোম্বাই। এলাহাবাদ থেকে বোম্বাই যাবার পথে বোম্বাই মেলের মধ্যেই মানেক পুরে

গ্রেপ্তার করাহল জহরলালকে। সে সময় জয়প্রকাশজী সঙ্গে ছিলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণজী তখন স্বরাজ ভবনে এ, আই, সি, সির অফিসে কাজ করতেন। আবার দেশের বড় বড় নেতাদের সব গ্রেপ্তার করা হল। সীমান্ত গান্ধী অব্দুল গাফ্ফারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে জারবেদা জেলে রাখা হয়েছে। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বোম্বাই শহরে একলক্ষ লোকের এক বিক্ষোভ মিছিল বার হয় এবং তা' পুলিশ বেষ্টনী ভেদ্ করে তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছায়। ১৯৩৪ সাল তখনও নেতৃহীন অবস্থাতেই দেশের মধ্যে আন্দোলন চলছে।

এ সময় এল বিহারের সেই ভয়াবহ ভূমিকম্প। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ ও অন্যান্য নেতারা তখন আন্দোলনের কথা চিন্তা করতে পারলেন না। তখনকার বিপন্ন মানুষদের সেবা করাই হোল তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। সরকারের কাছে আবেদন আকারে একথা জানান হল। এ আবেদন মঞ্জুর করে সরকার তৎপর জেলের দ্বার মুক্ত করে ছিলেন। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ জেল থেকে বেরিয়ে এসে স্বেচ্ছাসেবকদের যেই নেতৃত্ব দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দারুণ উদ্দীপনার সঙ্গে নব উৎসাহ সঞ্চার করল। বিরাট ভাবে সংগঠিত হল ত্রান কার্য্য। তখন শোনা গেছে, ভাইসরয় উইলিংডনের রিলিফ্ ফাণ্ড এবং বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের রিলিফ্ ফাণ্ডের টাকা প্রায় সমান সমান হয়েছিল। জেল থেকে একে একে বেরিয়ে এলেন জহর-লাল, যমুনা লাল বাজাজ আরো সর্ব্বভারতীয় নেতারা। আইন অমান্য আন্দোলন তখন পুরাপুরি থামান হল। ত্রান কার্য্যের জন্যে সরকার দমন নীতি আরো শিথিল করলেন, অত্যাচার বন্ধ করলেন, মুক্তি দিলেন সকল রাজবন্দীদের।

১৯৩৪ সালে বোম্বাইয়ে 'কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টি' নাম দিয়ে কং-গ্রেসের মধ্যে বামপন্থী আকারে যে সমাজতন্ত্রী দল সৃষ্টি হয়, সে দলের প্রধান ছিলেন লোকনায়ক জয় প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য্য নরেন দেব অরুণা আসফ আলি, অশোক মেহতা প্রমুখ বিখ্যাত নেতৃবৃন্দ এইভাবে

নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগতি চলতে থাকে।

নেতারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পাবার আগেই অসাধ্য সাধন করছেন। সেটি হোল রাজ্যে রাজ্যে যোগসূত্র ও রাজন্য বর্গদের প্রীতির বন্ধনে বেঁধেছেন যেমন পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ও পুরুষত্তম দাস ট্যাণ্ডন প্রভৃতি, তেমন উদার পৃষ্ঠপোষকতায় ও সর্ব্ব সহযোগিতায় সার্থক করেছেন ভারতেব মুক্তি সংগ্রামকে, জয় নগরের স্যার বি, এল, মিত্র, মহারাজ মনীন্দ্র নন্দী, মহারাজ শশীকান্ত, রাজা সুবোধ মল্লিক, জাষ্টিস্ স্যার মন্মথ মুখাৰ্জ্জী, স্যার তারক পালিত, বীর বিপ্লবী ডাঃ ভূপেন দত্ত, মহারাষ্ট্রের বীর নায়ক ডাঃ সাভারকার, ডাঃ তারকনাথ দাস, ডাঃ বিনয় সরকার, ময়মনসিংহের মধুদা, কুমিল্লার আসরাফউদ্দিন ও আহম্মদ চৌধুরী, চট্টগ্রামের মৌলানা মনিরুজ্জমা, বগুড়ার আব্দুল কাদের চৌধুরী, রাজসাহীর প্রভাস লাহিড়ী, ফরিদ পুরের অম্বিকা মজুমদার ও আশু ভরদ্দাজ, পাঞ্জাবের বাবা গুরমুখ সিং, মাদারী পুরের পূর্ন চন্দ্র দাস, ইফ্‌তিকার উদ্দিন ও খিজির হায়াৎ খাঁ, সিন্ধের আলাবকস্, এলাহাবাদের চন্দ্রশেখর আজাদ, চন্দননগরের মতিলাল রায়, শ্রীরাম পুরের তুলসী গোঁসাই, পুরুলিয়ার ঋষি নিবারণ দাশগুপ্ত, অতুল ঘোষ, বউবাজারের নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ, ঢাকা নবাব গঞ্জের আব্দুল করীম জেলানী, তেওতার কিরণ শঙ্কর রায়, বোম্বাইয়ের বিঠল ভাই প্যাটেল, কাশ্মীরের সেখ আব্দুল্লা, গুজরাটের মুরারজী দেশাই, বোম্বের ঘনশ্যাম বিরলা, ওয়াজিরিস্তানের ইন্‌ছোবা মণ্ডলাই পাণ্ডুয়ার ডাঃ সি, সি, ঘোষ, ওয়াজিরিস্তানের ইপির ফকীর, সীমান্তের গান্ধী আব্দুল গাফ্‌ফর খাঁন ও ডাঃ খানসাহেব এবং আরো অনেকে।

ওদিকে (১৯৩৩) মার্চ্চ মাসের মধ্যে পর পর তিনটি গোলটেবিল বৈঠক বসল। শেষ গোলটেবিল বৈঠকে কোন ভারতীয় নেতা উপস্থিত ছিলেন না। তথাপি ভারত শাসনতন্ত্র সংস্কার করা হল। শেষ গোল-

টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত, সরকারী প্রস্তাব সমন্বিত শ্বেত পত্র বা সরকারী দলিল প্রকাশ করা হল। এই বিবরনীর ওপর ভিত্তি করে (১৯৩৪) ডিসেম্বর মাসে একটি বিল পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাবিত বিলটি (১৯৩৫) আগষ্ট মাসে পার্লামেণ্টের অনুমোদন লাভ করে এবং তা' ভারত শাসন আইন রূপে বলবৎ হয়।

১৯৩৫ সালের নব নির্ম্মিত ভারত শাসন আইন কোন ভারতীয় রাজনৈতিক দলকে খুসী করতে পারেনি। তাই কংগ্রেস থেকে জহরলাল বললেন, 'এই শাসন ব্যবস্থাকে দাসত্বের আর এক নতুন অধ্যায় বলা যায়'। মুসলিম লীগ থেকে মিঃ জিন্না বললেন, 'এ আইন সম্পুর্নরূপে অসার, মূলতঃ দোষ যুক্ত এবং একেবারেই গ্রহণের অযোগ্য'। এ সময় লর্ড লিনলিথগো ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন (১৯৩৬-১৯৪০)।

ভারত শাসন আইন অনুসারে (১৯৩৭) ভারতে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হয়, তা'তে কংগ্রেস এগারটি প্রদেশের মধ্যে বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ ছাড়া আটটি প্রদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জ্জন করে ও মন্ত্রি সভা গঠন করে। কংগ্রেসের বিরাট সাফল্যে মুসলিম লীগ খুব অস্বস্তি বোধ করলেন।

সুভাষ বাবু বললেন, **The entire Intellect of the congress has been Mortgaged to one Man And he is Gandhiji**।

সুভাষ বাবু ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু পরবর্ত্তী ত্রিপুরী কংগ্রেসের দক্ষিণ পন্থীদের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটালে উক্ত সভাপতির পদ্ ত্যাগ করে সুভাষ বাবু ১৯৩৯ সালে 'ফরওয়াড ব্লক' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ৩রা সেপ্টেম্বর। বড়লাট লর্ড লিনলিথ্‌গো কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং বিভিন্ন রাজনৈ-
[illegible] কোন রকম সলাপরামর্শ না করে এ কংগ্রেসের

কে ন মতামত না নিয়েই তাঁর নিজের মতেই ভারতকে সরকার পক্ষে যুদ্ধের কাজে জড়িয়ে ফেলেন। এতে ভারত কংগ্রেস নেতারা বড়লাটকে বলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। কিন্তু বৃটিশ সরকার এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দিতে অসম্মত হন। এর প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ মনে কংগ্রেস তার সকল মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে, মন্ত্রীরা এক সঙ্গে বেরিয়ে আসেন। কংগ্রেসের এরূপ বিরোধিতার অবস্থা দেখে সরকার বিস্মিত হলেন ও মুসলিম লীগকে লর্ড লিনলিয়গো উদ্দেশ্য মূলকভাবে বেশী করেই তোষণ করতে লাগলেন। এরপর লর্ড-ওয়াভেল ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল রূপে ভারতে এলেন (১৯৪১—১৯৪৬)।

এই ইংরাজদের ব্যবসা বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ রকমের, বাজেট্ করে ব্যয় স্থির করে চলাটা ইংরেজদের মজ্জাগত। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের দেশী কর্ত্তারা একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন। আমাদের হিন্দু রাজা, পাঠান, মোগল, রাজপুত, মারাঠা, জাঠ, শিখ, যাঁদেরই নাম করা যাবে, এঁদের সবাই হিসেব করে চলার একেবারে বাইরে। ফলে এঁদের চিরকালটাই খাঁখ্তি আর টানাটানি। আয় বুঝে ব্যয় করা এখনও আমাদের সবারই স্বভাব বিরুদ্ধ।

———

নবম পর্ব্ব

পাকিস্তান পরিকল্পনা ও লাহোর অধিবেশন

আজ প্রহরা ঘাঁটিতে ঢুকতে ঢুকতে শুনছি, তর্ক চলেছে তুঙ্গে। নিশীথ জোর গলা করে বলছে, তোমরা যাই-ই বল। মহম্মদ আলি জিন্না কিন্তু পাকিস্তান পরিকল্পনার স্রষ্টা নন্। 'স্যার সৈয়দ (১৮৮৮) ঘোষণা করেছিলেন যে, 'হিন্দু ও মুসলমান দুইটি যুদ্ধরত জাতি, বৃটিশ রাজত্বের অবসান হলে এদের পক্ষে একত্রে বসবাস করা অসম্ভব'।

এরপর ভারতের অভ্যন্তরেই স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্রগঠনের পরিকল্পনা করেন প্রসিদ্ধ উর্দ্দু কবি মহম্মদ ইক্বাল। ১৯৩০ সালে তিনি প্রস্তাব করেন যে, 'ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হল, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান এই চারিটি মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলি একত্র করে, একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করা'। মহম্মদ ইক্বাল প্রস্তাবিত নতুন রাষ্ট্র গঠন 'পাকিস্তান' পরিকল্পনাটি লণ্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে পেশ করা হলে, সকলেই সহাস্যে প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করেন।

লণ্ডনে এই ইক্বাল প্রবর্ত্তিত পৃথক রাষ্ট্র ধারণার বিষয়টি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা কবা হয়। সেই সময় কেম্ব্রিজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত চৌধুরী রহমত আলি এক পাঞ্জাবি মুসলমান ছাত্র ও তাঁর সহপাঠী মহম্মদ আসলাম খাঁ, মহম্মদ সাদিক ও শেখ এনায়েতুল্লা কর্ত্তৃক 'Now or Never' নামে চার পাতার একখানি পুস্তিকা প্রচার করা হয়। এতেও পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান প্রভৃতি এলাকাগুলি নিয়ে একত্র করে একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবী তোলা হয়।

বলা হল যে, **'Muslims are separate nation and are therefore entiled to a separate state of their own.**

বোনা বলে উঠল, কিন্তু ১৯৩৩ সালে আগষ্ট মাসে সর্ব্বভারতীয় মুসলিম লীগ ও লীগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্না পালামেন্টারী সিলেক্ট কমিটীর সামনে এরূপ পাকিস্তান পরিকল্পনাকে অবাস্তব বলে ঘোষণা করেন। এতে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রয়াসী মুসলিম লীগেব কিছু সংখ্যক ছোট ও বড় নেতা, যাঁরা বেশী করে কংগ্রেস ও হিন্দু বিদ্বেষী, তাঁবা লীগ নেতা জিন্নার সমালোচনায় বললেন, 'জিন্না হচ্ছেন হিন্দু ও কংগ্রেস ভক্ত লোক। ওঁর সাক্ষীতেই তা' প্রমাণ পেয়েছে'। এইসব অপপ্রচার প্রসার লাভ করতে থাকলে জিন্না সাহেব একটি ছোট্ট কাণ্ড কবলেন।

লীগের একটি জমায়েতে জিন্না সাহের যাবেন। বাড়ীর নিচেতে লোকজন জমছে। একটি ট্যাক্সি বাড়ীর সামনে রাখা হয়েছে। জিন্না সাহেবের নিচে নামতে দেরী হচ্ছে। তিনি নাকি সাজ গোজ করছেন। একজন বললেন, জিন্না সাহেব বাবুগিরিতে একজন নবাব আমীরের চেয়ে কম নয়। জিন্না সাহেবের জুতোই আছে আশি জোড়া। সেইসব জুতো উনি প্রায়ই পায়ে দেন। তা'হলে ওঁর খিদমদ্‌গার কতজন আছে চিন্তা করুন। এমন সময় জিন্না সাহেব চট্‌পট্‌ এসে হাজির। মিঃ জিন্না তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতে উঠতে গিয়ে আর উঠ্‌লেন না। জিন্না বললেন, হিন্দু-পাঞ্জাবীর গাড়ীতে আমি চড়িনা। এ গাড়ী ফিরিয়ে অন্য গাড়ী আন। সঙ্গে সঙ্গে তাই করা হল। এতে লীগ সম্প্রদায়ের সকলেই খুসী। সিলেক্ট কমিটীর সামনে জাতীয়তা বাদী হিসাবে জিন্নার সাক্ষী দেওয়ার বিষয় সব চাপা পড়ে গেল।

নিতাই বললে, বোম্বাই শহরে (১৯৩৬) মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনের সভাপতি হন স্যার উজির হাসান। তিনি অধিবেশনে ঘোষণা করেন, 'একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ, এ দেশে হিন্দ ও মসলমা-

মাত্র নয়, নানা দিক্ হতে দু'টি স্বতন্ত্র জাতি'।

এরপর ১৯৩৭—৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মুসলিম লীগ প্রচার করলে যে, কংগ্রেসের এই দুই বছর শাসনে মুসলমানদের অনেক রকমের স্বার্থহানি ঘটান হয়েছে। এ ধরনের কথা প্রচারে সাম্প্রদায়িক মনোভাব আরো তীব্রতর হয়। অপর দিকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলিও ক্রমে উগ্র ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। তাঁরা প্রকাশ্যেই প্রচার করতে লাগলেন যে, আমাদের উদ্দেশ্য হল ভারতবর্ষে হিন্দু রাজত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা।

এইভাবে উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতার বিষ উদ্গীরণে মুসলমানদের মধ্যে লীগের প্রভাব প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় গান্ধীজী, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতারা অত্যন্ত বিচলিত হলেন। কারণ এঁরা নিশ্চিতভাবেই জানেন যে, হিন্দু ও মুসলমানদের যৌথ দাবী ব্যতীত স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব।

গৌরাঙ্গবাবু বললেন, তাইতো গান্ধীজী মিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু লীগ নেতা জিন্না গান্ধীজীর কাছে এসে সাক্ষাৎ করতে রাজী হলেন না। এ অপমান তুচ্ছ করে, দেশ ও জাতির স্বার্থে মহাত্মাজী তাঁর নিরভিমান মন নিয়ে, লীগ ও কংগ্রেসের মিলনের জন্যে বোম্বাইয়ে মালাবার হিল্ জিন্নার বাড়ীতে চললেন লীগ নেতা জিন্নার সঙ্গে হাত মেলাতে। ভারতের জনমত দুলে উঠল। দেশের বহু বড় বড় প্রতিষ্ঠান থেকে দারুণ আপত্তি উঠল। কিন্তু গান্ধীজী কারো কথায় কর্ণপাত করলেন না, চললেন লীগ নেতার কাছে। যাবার সময় গান্ধীজী বলতে বলতে গেলেন, 'আমি যে আজ জিন্না সাহেবের কাছে যাচ্ছি এতে আমার প্রাণে এক নতুন আনন্দের পুলক শিহরণ লাগছে। নববধূ তার স্বামীর কাছে প্রথম সাক্ষাতে যেমন পা টিপে টিপে যায়, তেমনি দুরু দুরু বক্ষ অথচ অফুরন্ত আনন্দ আমার মনকে পুলকিত করে তুলছে'।

এরূপ নানা রসিকতার সঙ্গে মহাত্মাজী জিন্না সাহেবের কাছে গেলেন। যাবার পর রুদ্ধ দ্বারে তাঁদের আলাপ আলোচনা চলতে থাকে।

সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন. তাঁদের কি মীমাংসা হয়, তা' শুনবেন। প্রেসের প্রতিনিধিরা কাগজে ছাপালেন যে, দু'জনকেই বেশ প্রফুল্ল দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আসল তত্ত্ব এখনও কিছু জানা যায়নি। ক'দিন পরে কাগজে খবর বেরুল যে, গান্ধী-জিন্না প্যাক্ট সম্ভব হয়নি। গান্ধীজী ব্ল্যাঙ্ক চেক্ ফেলে দেওয়া সত্ত্বেও মিঃ জিন্না মীমাংসায় আসতে রাজী নয়। মহাত্মাজী বিফল মনোরথ হয়েই ফিরলেন।

মিঃ জিন্নার এরূপ ব্যবহারে ও মত পরিবর্ত্তনে কংগ্রেস সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কংগ্রেস বিরোধী হিন্দুরাও খুব রুষ্ট হলেন। এক শ্রেণীর মুসলিম, যাঁরা তখনও জিন্না সাহেবের নাম পর্য্যন্ত শোনেননি তাঁরাও জিন্নার মস্তিষ্কের তারিফ করলেন এবং জিন্নাকে মুসলিমদের উপযুক্ত নেতা বলে মেনে নিলেন। এইভাবে সাধারণ জনজীবন আলোড়নে নিরপেক্ষ মুসলিম ও হিন্দু গোষ্ঠীর দল ভেঙ্গে লীগ ও কংগ্রেসের সভ্য সংখ্যা বেড়ে, উভয় দলই আরো পুষ্ট হতে লাগল।

ক্ষুদে নেতারা চারিদিকে বলে বেড়ালেন, গান্ধী জিন্নার এই মতদ্বৈধতা কোন দফার দাবী নিয়ে নয়। গান্ধীজী স্বয়ং জাতীয়তাবাদী বলে দাবী করতে চান, আর জিন্না সাহেব চান সম্প্রদায়গত ভাবে স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে। তাই মহাত্মা গান্ধীজীকে মিঃ জিন্না বলেন, 'ওতো হিন্দু লিডার' গান্ধীজীকে মহাত্মা বলে নাকি কোনদিন ডাকেন নি। কেউ বলেন, এটা জিন্না সাহেবের সম্প্রদায়গত ভাবে রাগ। কেউ বলেন, না-না তা' নয় ওঁদের মধ্যে আছে গভীর বন্ধুত্ব।

মুসলিম লীগ পত্তনের অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি মহম্মদ শাহ আগা খাঁ (১৯৩৩) ব্রিটিশ মিশনের সামনেই বলেছিলেন, 'স্বায়ত্ত্বশাসন' গ্রহণে ভারত এখনও শিশু। এ কথাটি কাগজে প্রকাশ পেল। এতে দ্ব্যর্থবোধ হল এই যে এখন ভারত যেমন শিশু, তেমন সাবালক হলেই স্বায়ত্ত্বশাসন গ্রহণে সক্ষম হবে। মহামান্য আগা খাঁ ভারতের মানুষদের নিরুৎসাহের মধ্যে বেশ ভালভাবেই উৎসাহিত করলেন। কিন্তু আমরা সাধারণ হিন্দু

মুসলমান এতদূর তলিয়ে কেউ না বুঝে, খুব বিদ্বেষ মনোভাব নিয়েই আগাখাঁর নিন্দা করে বেড়ালুম।

পরে এই আগাখাঁকেই দেখা গেল লণ্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসার আগেই, এই খাঁ সাহেবের খরচ ও চেষ্টায় লণ্ডনবাসী ভারতীয়দের নিয়ে একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং গান্ধীজী লণ্ডনে পৌঁছবার সময় এই দলকে দিয়েই বিপুল সমাদরে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন। যার ফলে, লণ্ডন শহরে ও গ্রামে মস্ত হৈ চৈ পড়ে গেল যে, ভারতবর্ষ থেকে এক ল্যাংটা ফকীর এসেছেন। এরপর গান্ধীজী কৌপিন (ছোট ধুতি) পরেই লণ্ডনে ঘুরলেন ও স্বয়ং পঞ্চম জর্জের সঙ্গে করমর্দ্দন করে ভারতীয়দের জাতীয় পোষাকের মর্য্যাদা বাড়ালেন শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনের পরিচ্ছদ্ আইন অমান্য করাও হয়ে গেল।

(১৯৪০) মার্চ্চ মাসে লাহোর অধিবেশনে লীগ ঘোষণা করলে যে, তার লক্ষ্য হল 'পাকিস্তান'। পাকিস্তান সৃষ্টির এক নতুন পরিকল্পনা নেয়া হ'ল। দেশ ভাগাভাগি না করে, যাঁরা যেখানে আছেন সেইখানেই থাকবেন। ভারতের মধ্যেই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিকে 'স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র' হিসাবে গড়ে তোলার অধিকার দাবী করা হ'ল। কংগ্রেসের অনেক নেতা ভেতরে ভেতরে এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। কারণ হ'ল, অভিজ্ঞ দেশ নেতারা নিজেদের দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যে আর প্রার্থীরূপে বৃটিশের ঘরে ধর্ণা দিতে বা জেলে যেতে চান না। তাই ভারত নেতারা একমত হয়ে অখণ্ড ভারতের মধ্যেই লীগ ও কংগ্রেসের লোক মিলে, দিকে দিকে মুসলিম ও হিন্দুদের স্বায়ত্ব শাসনের খণ্ড খণ্ড রাজ্য গড়ে তুলতে চাইলেন। ইচ্ছে বোধ হয়, বৃটিশ সিংহরাজকে দেশের তৃতীয়পক্ষ রূপে অকেজো করে বসিয়ে রেখে, নিজেদের দেশের শাসন কার্য্য নিজেরাই পরিচালনা করবেন। কিছু কিছু নির্দ্দলীয় বুদ্ধিজীবিদের মধ্যেও এ প্রস্তাব সমর্থন লাভ করেছিল। কিন্তু এমনই দৈব বিড়ম্বনা যে, লীগের একদল শক্তিমান নেতা এ প্রস্তাবে বাদ সাধলেন। তাঁরা বললেন, 'স্বাধীনতা

নিষ্কণ্টক করতে হলে দেশ বিভাগ ও সম্প্রদায়গতভাবে ভিন্নরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে'।

অনেকের এরূপ বিরোধী মনোভাব দেখে, লীগের ওপর থাকের নেতাদের উদ্যোগে একটি রিপোর্ট ছাপান হল। 'কংগ্রেসের কুকীর্ত্তি' নামে একটি ফিরিস্তি প্রকাশ করা হ'ল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কংগ্রেসের কীর্ত্তিগুলি সত্যি সত্যিই 'কু' কিনা, এ বিষয়ে সমালোচনা করাতো দূরের কথা, সাধারণ মুসলিমদের কেউ ফিরিস্তিটি পড়ে দেখার বিষয়েও কোন মনোযোগ দিলেন না। তাই এ ক্ষেত্রে বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা অর্জ্জনের অতি সহজ সমাধানের পন্থাই দেখান হ'ল, কিন্তু এটা সুসম্পন্ন করা গেল না।

অমিয় বললে, জনাব ফজলুল হক কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে লীগ নেতার চেয়ে কম নয়। এঁদের তুল্যমূল্য বলা চলে। জনাব হক সাহেব তাঁর দেশপ্রেম ও বুদ্ধিমত্তার জোরে বৃটিশের চলতি আইন পালটে দরিদ্র চাষী প্রজাদের দারিদ্র্য ঘোচাতে যেমন বিবিধ বোর্ড সৃষ্টি করে দিলেন, তেমন ১৯৪১ সালে (Census) আদম সুমারীর সময় হিন্দুদের ১৪৫ রকমের জাতিভেদকে এক করে শুধু 'হিন্দু' লেখার কড়া নির্দ্দেশ দেন। সেন্সাস ফর্মে সকলে তাই লিখল। এরপর হতে হিন্দুদের জাতি লিখতে এখন আর মুচি, ম্যাথর, হাড়ি, বাগদি, ডোম, বামুন, বৈদ্য, শূদ্র, তাঁতি, জোলা, মাঝি, মাল্লা, নাপিত, ধোপা, তেলি, তামলি, কলু, বেনে, যুগী, জেলে, ভীল, সাঁওতাল, লিখতে হয় না। খুচরা জাতি গুলি এখন এক ঢালায় পড়েছে। তাই জাতির ঘরে 'হিন্দু' লিখলেই বেশ চলে যাচ্ছে।

এইভাবে সমাজ নেতারা ও সকল দল নেতারা মিলে হিন্দু জাতির মধ্যে খুচরা জাতির সংখ্যা যদি কমিয়ে আনতে পারেন বা সকলে স্বেচ্ছায় এফিডেভিট মাধ্যমে পদবী বদল করে নেন অথবা সরকারের আইন বলে রেজেষ্ট্রী বিবাহে জোর দেন, তবে হয়তো অচিরেই আমরা, হিন্দুরা মেয়ের বিয়েতে পণ দায়, অসবর্ন বিবাহ ও জাত-পাতের দন্দ্ব থেকে মুক্তি পেতে পারি।

হক সাহেবের আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। হক সাহেব ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ। হক্ বিরোধী লীগের দল কাল পতাকা উড়িয়ে হকের নিন্দায় মুখর। হক সমর্থক মুসলিমদের কেউ সে মহল্লায় ঢুকতেই পারছেন না। অথচ ওই পাড়াতেই অনেক মুসলিম ভোটার আছেন। হকের ভোট কর্তারা একেবারে নিরুপায় হয়ে হক সাহেবকে জানালেন। হক সাহেব একথা শুনেই বললেন, 'ও পাড়াতে এক 'পীর' সাহেবের দরগা আছে। চলো আমরা আগামী ভোরে ওখানে গিয়ে দোয়া মেগে আসব তা'হলেই আমাদের জয় হবে'।

পরদিন প্রত্যুষে হক্ সাহেব পাক সাফ হয়ে, পবিত্রভাবে সকলে গিয়ে পীরের দরগার চারিধারে ফুল, গোলাপজল, আতর ছড়িয়ে, ফুলের মালা পরিয়ে, নীরবে বসে দোয়া মেগে এলেন। অনুচরেরা প্রচার করলেন, ওই পীর সাহেবের শিষ্য হচ্ছেন হক্ সাহেব। পাড়া একেবারে সরগরম। হক্ বিরোধী মুসলিমরা বুঝলেন, ফজলুল হক্ তাঁদের পীর-ভাই। সেই থেকে লীগের মুসলিম সকলেই পীর ভাই হক সাহেবের পক্ষে ভোট সাধতে শুরু করে দিলেন। এর ফলে হক্ সাহেব ওখান থেকে বহু ভোটাধিক্যে জয়ী হলেন।

সন্ন্যাসী বললে, অমিয়র এসব গাঁজা বসে বসে শুনতে হবে? তার চেয়ে বাবা, হচ্ছে—হোগ্ গে, যাগ্ গে—থাক্ গে করে পথ চললে কোন আর দ্বন্দ্ব হয়না। শচীনদা বললে, আঃ—থামোনা। কেউ কিছু বলবার সময় ওরকম যা' তা' বক কেন? যা' বলে চুপটি করে শোন।

প্রফুল্ল বললে, ফজলুল হক সাহেবের অভিন্ন বন্ধু হিন্দু মহাসভার গোঁড়া হিন্দু, কংগ্রেস ভক্ত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ।

নিশীথ বলে উঠল—হিয়ার! হিয়ার! হিন্দু মহাসভার গোঁড়া হিন্দু নামে পরিচিত শ্যামাপ্রসাদবাবু কংগ্রেস ভক্তই বটে. কেন্দ্রীয় পরিষদদের ইলেক্সানে এঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বাবু নগেন মুখুয্যেকে দাঁড়ানোর সুযোগ দিতে শ্যামাপ্রসাদবাবুর কংগ্রেস প্রীতি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

আরো একটু বুঝে দেখনা। বাংলার নেতা নির্ব্বাচনের জন্যে কংগ্রেস যেমন জাত সম্ভ্রান্ত জননেতা শ্যামাপ্রসাদবাবুকেই প্রথম প্রস্তাব দিলেন, তেমন সঙ্গে সঙ্গে লীগও তার সমর্থন জানাতে মিঃ জিন্না আতঙ্কের ভান করে বললেন 'শ্যামাপ্রসাদের প্রতিভাকে ক্ষুন্ন করতে হবে'।

কংগ্রেসের প্রস্তাব ও লীগের এরূপ সমর্থনের কারসাজিতে হিন্দুরা যেমন সাহসের ওপর ভর করে দাঙ্গা ভয় কাটিয়ে কতকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন, তেমন লীগের মুসলিমরা কিছুটা আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলেন। ওঁরা কেবলই মনে ভাবতে লাগলেন যে, শ্যামা-প্রসাদের নাম শুনে বেপরোয়া লীগ নেতার যদি আতঙ্কে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে, তবে আমরা তো তার কাছে কিছুই নয়। আচ্ছা লড়্‌দার দস্যু সর্দ্দার তো শ্যামাপ্রসাদ।

দশম পর্ব্ব

সুভাষের ভারত ত্যাগ ও রাসবিহারীর কার্য্যোদ্যম

আমরা বসে আছি, অমিয় ও সত্য এসে পাশে বসল। কথা প্রসঙ্গে অমিয় বললে, 'শুনেছ! এ দাঙ্গার তোড়জোড় লীগের লাহোর অধিবেশনের পর থেকেই দেশের মধ্যে চল্‌ছে। আজাদ্ পত্রিকায় নরম গরম বক্তৃতা. আলাহিদা হ্যাণ্ডবিল, পার্শ্বেল করে ছোরাছুরি ও মারন অস্ত্র দেশে দেশে পাঠান, আরো অনেক কিছু ব্যবস্থা করে, তবে দাঙ্গাটি বাঁধান হয়েছে। ব্যাপারটি খুব তুচ্ছ নয়।

সত্য বললে. তুচ্ছ নয়তো বটেই। অনেক দিন ধরেই যখন দেশের মধ্যে এতসব তোড়জোড় চলছে, অথচ ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সব জেনে শুনেও যখন এ বিষয়ের কোন কিছু আপত্তি করেননি, তখন বুঝতে হবে যে, দেশ নেতারা যুক্তি করেই দেশের মধ্যে এ আগুণ জ্বালিয়ে তুলেছেন।

অমিয় বললে, রাজনীতি অত ছেলে খেলার বস্তু নয় সত্য, যে শুধু ধরে নেওয়া বা কল্পনার তুলি বুলিয়ে কবিতায় পরিণত করবে?

প্রফুল্ল বললে, আপনি কি একটিও নজির দেখাতে পারেন যে, রাজনীতিবিদ্‌রা শুধু ধ'রে নেওয়া ও কল্পনার ওপর নির্ভর না করে, এক পা কোথাও অগ্রসর হতে পেরেছেন? ধরুণ বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্ মন্ত্র' একদিন ভারতের জাগরণ আনবে এওতো ছিল কল্পনা।

নিশীথ বললে, একথাতো সত্যি, এই যে মহাত্মাজী ভারতের মর্য্যাদা বাড়াবার জন্যে বিদুষী বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিতকে 'শান্তি সংসদ বৈঠক' বসবার কত আগে থাকতে আমেরিকায় পাঠিয়ে ছিলেন। মহাত্মাজীর কল্পনা ও আন্দাজের ওপর পাঠানতে শেষে বিজয় লক্ষ্মী বিশ্বজয়ী তো হলেন

সত্য বললে, ঠিক তাই। এইযে যুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার কত টাকা খরচ করে, রকম রকম সেণ্টার, এ, আর, পি ও সিভিগ্ গার্ডের দল সৃষ্টি করলেন। কিন্তু এ্যাটম বোমার যুগে সেগুলি আর কোন কাজে এল না। তবে কি আমরা মনে করব যে, এ ধরনের আন্দাজের ওপর এত বেশী বেশী টাকা খরচ করা সরকার পক্ষের খুব ভুল হয়েছে? এই আমাদেধ সুভাষ বাবু দেশ স্বাধীন করার পক্ষে একটা কিছু করবেন, এই আন্দাজ নিয়েই ভারতের বাইরে যান। তাঁর সে আন্দাজ অনেকটা ঠিক হয়েছে বাকিটা এখনও হয়ে ওঠেনি। তাই বলে কি আমরা বলব যে, সুভাষ বাবুর এ আন্দাজটা ঠিক, বাকিটা ঠিক নয়? কবির কল্পনা?

নিশীথ বললে—১৯৪১ সালে ২১শে জানুয়ারী সুভাষ বাবু নিরুদ্দেশ হলেন। সকলেরই বেশ চমক লাগল। সকলের মধ্যে বলাবলি হতে লাগল যে, সুভাষ এলগিন রোডে তাঁর নিজের বাড়ীতে থাকলেও তিনিতো ছিলেন সরকারের নজর বন্দী। চব্বিশ ঘণ্টাই তো সিপাই পাহারায় বেষ্টিত ছিলেন। অকস্মাৎ অন্তর্ধান হলেন কি করে? সরকার পক্ষ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। দেশের মধ্যে নানা রকম গুজব ছড়াতে লাগল! কেউ বললেন, সুভাষ ভারতের মধ্যেই কোথাও আছেন। কেউ বললেন, গান্ধী-জীর সঙ্গে রাজনীতির মতের দ্বন্দ্বের কারণে বিদেশ থেকে যুদ্ধ করবার জন্যে সুভাষ দেশ ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ বললেন, না-না। গান্ধীজী সুভাষকে দায়িত্ব পূর্ন কাজের ভার দিয়ে ভারতের বাইরে পাঠিয়েছেন। সন্ন্যাসী বললে, একথা সত্য হতে পারে। ধরো, আমি যদি ভাবি যে, হক্ সাহেবের অনুগত নাজিমুদ্দিন ও সুরাবর্দ্দি দু'জনে সহোদর নকুল ও সহদেবের মত, প্রিয় অভিমন্যু সুভাষ বাবুকে ছদ্ম বেশে সাজিয়ে সতর্ক প্রহরায় প্রথম উধাও করা হয় ও বাংলা দেশ পার করা অবধি এঁরা সঙ্গে ছিলেন, তাইবা বিচিত্র কি?

নন্দদা বললে, তোমার ওকথা রাখ। সুভাষ নিরুদ্দেশ! সারা ভারতে এ নিয়ে একটা মস্ত সোর গোল উঠল। সরকার খোঁজ খবর করে এর

কোন কিনারাই করতে পারছেন না। নেতারা চিন্তায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সবার চেয়ে কিন্তু বেশী চিন্তিত দেখা গেল গান্ধীজীকে। এই জন্যেই জোর গুজব রটেছে যে, গান্ধীজী সুভাষকে পাঠিয়েছেন, এই নাকি নিরুদ্দেশের ইতিহাস এবং এর সাক্ষী হলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব।

পাঁচুদা বললে, সর্ব্বজনপ্রিয় আমাদের বিকলাঙ্গ সাংবাদিক নৃপেনদা সুভাষবাবুর অন্তর্ধানের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, সুভাষের এলগীন রোডের বাড়ীতে থাকা বা রাখার জন্যে তৎকালীন বাংলার প্রধান মন্ত্রী এ, কে, ফজলুল হক সাহেব সব জেনে শুনেই এ ধরণের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং হক সাহেব জানতেন যে, সুভাষ দেশের বাইরে চলে যাবেন। তাই সুভাষের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকালে হক সাহেবের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়েছিল।

কেশবদা বললে, 'হলওয়েল মনুমেণ্ট' অপসারণ ও এর আগের দিনের বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে 'ভারত রক্ষা' আইনে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে সরকার সুভাষ বাবুর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় বিচারাধীন থাকার সময় সুভাষ বাবু দেশ ত্যাগ করেন। দেশ ত্যাগের পর সুভাষকে না পাওয়া গেলে সরকার ১৯৪১ সালে ৫ই ফেব্রুয়ারী সুভাষ বাবুর এলগীন রোডের বাড়ীতে ক্রোক' করার জন্যে পাইক ও পিয়াদা পাঠান। শেষে ১০ই মার্চ্চ (১৯৪১) ঐ বাড়ীতে এই মর্ম্মে একটি নোটিশ লট্‌কে দেওয়া হয়। কিন্তু দেশের কোন পার্টির লোক বা কোন ধনী লোক এই নিলাম ডাকতে এগিয়ে আসেননি। বাড়ীটি ওইভাবেই পড়েছিল। তারপর ১৯৪৬ সালে ওই বাড়ী নেতাজী ভবন' করা হয়েছে।

নিশীথ বললে সুভাষ বাবুর অন্তর্ধানের পর সুভাষ বাবুর 'ফরওয়ার্ড ব্লক' এই অজুহাতে ফরওয়ার্ড ব্লকের সকল কর্মীদের সরকার যখন এ্যারেষ্ট করতে চাইলেন ও ফরওয়ার্ড ব্লক দলকে ইল্লিগ্যান প্রতিষ্ঠান বলে প্রচার করলেন। এই ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রেসিডেন্ট মিঃ শার্দ্দুল সিং যখন পাঞ্জাব [illegible] তখন ফরওয়ার্ড ব্লক দল বিরোধী কংগ্রেসের জহরলাল

নেহেরু কলকাতায় ছুটে এসে কৈফিয়ৎ দিলেন যে, এঁরা সকলে কংগ্রেসের সভ্য, ভুল ক্রমে ফরওয়ার্ড ব্লকের সভ্য হয়েছেন। এই ভাবে তাঁর বক্তৃতার কৌশলে বহু কর্ম্মীকে আবার কংগ্রেসে ফিরিয়ে নিয়ে যান। নিশীথ বললে, সুভাষ বাবুর মত একদিন রাসবিহারী বোস ভারতের পক্ষে বহু কিছু করার পর যখন সিঙ্গাপুরে 'পূর্ব্ব এশিয়া ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ' নামে এক বিশেষ প্রতিষ্ঠান করেন, তখনও শোনা গেছে সুভাষ বাবু জার্ম্মানীতে কর্ম্মরত অবস্থায় কার ডাকের জন্যে যেন উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছেন।

এমন সময় রাসবিহারী সাদর আহ্বান জানালেন তাঁর প্রিয় দেশ গৌরব সুভাষকে। সুভাষ তৎপর তার সঙ্গে প্রেরিত সাবমেরিন যোগে গেলেন রাসবিহারীর কাছে। ৪ঠা জুলাই (১৯৪৩) 'এশিয়া ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের' বিরাট জন সমাবেশে রাসবিহারী তাঁর বিশ্বাসী চির নির্ভীক সুভাষকে সকল কাজের গুরু দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে 'ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের' সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত করেন এবং সুভাষ বসুকে 'নেতাজী' আখ্যায় ভূষিত করেন। নেতাজী সুভাষ তখন তাঁর প্রতি-ভাষণে বলেন 'এই মহান জন নায়কের ভারত মুক্তির বিস্ময়কর কার্য্যাবলীর কথা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল ভাবে লেখা থাকবে শুধু তাই নয়, বৃটিশ সাম্রাজ্যের দলিলেও নথিভুক্ত হয়ে থাকবে চিরকাল'।

সত্য বললে, তা' বটে। বাংলার বোসে বোসেই বোধহয় স্বাধীনতা আনবে। তবে এর মধ্যে রাসবিহারী বোস যেন কৌশলী বিপ্লবীদের বড়দা। এই রাসবিহারী বোসকে আমরা ভাল করে চিনিনা। এর জন্যে আমাদের দোষও দেওয়া যায়না। কারণ রাসবিহারী এখান থেকে দীর্ঘদিন নির্ব্বাসিত। কেশবদা বললে, ১২ই নভেম্বর (১৯৫৪) আনন্দবাজার পত্রিকায় নেতাজী ও হকসাহেব শিরোনামায় প্রকাশ। ইউরোপে আজাদ্ হিন্দ দপ্তরের সাধারণ সম্পাদক শ্রীএম, আর, বসু ১৯৪১—৪৩ নেতাজীর বিষয় নানা কথা বলতে গিয়ে বলেছেন সময়ে সময়ে সুভাষবাবু নিজে থেকেই মন্তব্য করতেন যে. ভারত থেকে আরো দু' একজন রাজনৈতিক

নেতা এসে 'আজাদ হিন্দের সরকারে' যোগদান করলে ভাল হত। বিশেষ করে নেতাজী এমন কথাও বলেছেন যে সব চেয়ে ভাল হত, চুরি করে এনেও যদি ফজলুল হক সাহেবকে আজাদ হিন্দের সরকারে বসাতে পারতুম।' এখানে সাংবাদিক নৃপেনদার কথাগুলি সবই এখন সত্য বলেই মনে হচ্ছে।

নিশীথ বললে এই সঙ্গে তবে আর একটি খবরও শোন। ২৪।৯।৭৫ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশ। 'বিবাদী সুভাষচন্দ্র ও বাদী ষষ্ঠ জজ, এ মামলাটি শুরু হয় ১৯৪০ সালে। আদালতের নাম ব্যাঙ্কশাল কোর্ট দীর্ঘ ৩০ ত্রিশ বছর মামলা চলার পর খারিজ হল ১৯৭১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারীতে। আদালতের 'হীরক জয়ন্তীতে' এ তথ্য পরিস্কারভাবে জানা গেছে'

নন্দদা বললে, এখন নেতাজীর কন্যা অনিতা সম্বন্ধে আর আমাদের দ্বিমত নেই। অনিতা সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। স্বাধীনতা দিবসে ১৫।৮।৭৯ নেতাজীর চিত্র-জীবনী প্রকাশের অনুষ্ঠানে, নেতাজীর কন্যা বললেন, 'অনেকের ধারনা, নেতাজী যদি ফিরে আসতেন তা'হলে দেশের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত, কিন্তু তা' হয়না। কোন নেতাই ম্যাজিক জানেন না। নিজের সমস্যার সমাধান নিজেকেই করতে হবে। বড় নেতা পাশে এসে দাঁড়াতে পারেন মাত্র'।

অনিতা আমাদের কাছে ছেলে মানুষ হলেও এর কথাগুলি সকলের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।



একাদশ পর্ব্ব

ক্রীপস মিশনের সিমলা বৈঠক পণ্ড

সকালে বন্ধুরা বসে চা-পানের সঙ্গে বেতারে বাংলা খবর শুনছি। 'কলকাতার আবহাওয়া শান্ত। সমস্ত দিনের মধ্যে মাত্র তেরটি ছোরা মারার সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। উপদ্রুত এলাকায় সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় নিযুক্ত আছে। উত্তর কলকাতায় দুইটি গৃহ ভস্মীভূত। আজ মাত্র একুশবার দমকল ব্যবহার করা হয়েছিল। বম্বেতে পাঁচটি ছোরা মারার খবর পাওয়া গিয়েছে। অবস্থা ক্রমশঃ আয়ত্বের মধ্যে আসছে।' এরপরই রেডিওটি বন্ধ করে আলোচনা শুরু করা হল।

পাঁচুদা বললে, অসুখ যত জটিল হবে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা তত কঠিনতর করতে হবে। তাই অবিবেচক ভারতবাসীর শতধা বিচ্ছিন্নমত। গৃহ বিবাদ, মনগড়া সমাজ ধর্ম্মের গোঁয়ার্তুমীর কু-অভ্যাস বদল করতে গিয়ে এ কঠিন নৃশংস অবস্থার অবতারণা করতে হয়েছে। এ হচ্ছে বোধ হয়, এক জাতি, এক প্রাণ, একতা আনার বিরাট অভিযান।

অমিয় বললে, তুমি আর বাজে বোকনা। এদিকে কি শুনছি শোন। (১৯৪২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্ম্মানী ও ইতালীর মিত্রশক্তি হিসাবে জাপান তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশ অধিকার করেছে। এতে বৃটিশ সরকার অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছেন। সত্য বললে, তাই বোধহয় গান্ধীজী বললেন যে, 'বৃটিশ যদি ভারত ছেড়ে চলে যান, তবেই জাপানের হাত থেকে ভারত ও আমরা রক্ষা পেতে পারি'। এ কথাটি কাগজে প্রকাশ পেয়েছে। এরপর বৃটিশ যুদ্ধের পরিস্থিতি

.েখে প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল তাব মন্ত্রীসভাব সদস্য স্যাব ষ্ট্যাফোড ীপস্কে তাড়াতাড়ি ভাবতেব নেতৃবৃন্দেব সঙ্গে আলাপ আলোচনা কবতে একটি মন্ত্রী মিশন পাঠাচ্ছেন।

অমিঃ বললে, বোধহয় জাপানীদেব আক্রমনেব বিরুদ্ধে ভাবতীয়দেব যুদ্ধে নামানোর জন্যেই ষ্ট্যাফোড ক্রিপস্ ভাবতে আসছেন। এইটাই হবে' ক্রীপস কৌত্যেব মূল উদ্দেশ্য। তাই তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল কংগ্রেসেব স্বাধীনতা দাবী ও লীগেব পাকিস্থান দাবীর মধ্যে আপোষ মীমাংসাব নামে দু'দলে আরো বেশী করে দ্বন্দ্ব পাকিয়ে তোলবাব জন্যে ষ্ট্যাফোড ক্রীপস্ এব মত কূটনীতিবিদ্ বাজনীতিজ্ঞকে ভাবতে পাঠাচ্ছেন।

সত্য বললে, ঠিক তাই। এখন লণ্ডনে ষ্ট্যাফোড ক্রীপস এর জন-প্রিয়তা খুব বেশী। কাবণ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে হিটলাবী সংগ্রামে ব্রিটিশ যখন আত্মরক্ষার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, তখন মস্কোব বৃটিশ বাজ-দূতরূপে ক্রীপস্ রাশিয়ায় গিয়ে নানা আলোচনাব মাধ্যমে রাশিয়াকে বৃটিশের পক্ষে এনে, জার্ম্মানদের বিপক্ষে যুদ্ধে নামিয়ে নিজেদের কার্য্যো-দ্ধার করেছেন। এ ঘটনা সাম্প্রতিক ও প্রত্যক্ষ। সেই সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন কূট বাজনীতিজ্ঞ পুরুষ স্যাব ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ভারতে আসছেন। এটা ভাবত নেতাদের চিন্তার বিষয় বৈকি।

২২শে মার্চ্চ (১৯৪২) ব্রিটিশ মন্ত্রীদেব জরুরী প্রস্তাব নিয়ে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস তাঁর মিশন নিয়ে ভারতে এলেন। ভাবতে সকল রাজ-নৈতিক দলের মধ্যে একটা মস্ত সাড়া পড়ে গেল। নেতৃবৃন্দ চিন্তায় পড়লেন। সবার মনে প্রশ্ন জাগল যে, ক্রীপস্ কি সত্যি সত্যিই সরল মন নিয়ে ভারত নেতাদেব হাতে স্বরাজ তুলে দিতে এসেছেন?

ক্রীপস ভারত নেতাদের সঙ্গে মতের আদান প্রদান কবে বললেন, তোমরা যুদ্ধে নামো আমরা তোমাদের স্বাধীনতা দিয়ে খুসী করব। তবে কিন্তু 'স্বাধীনতা দেয়া হবে যুদ্ধে জয়ী হবার পরে'। ক্রীপস্ এর

প্রস্তাবের কায়দায় ও কথার মারপ্যাচে প্রায় সব নেতারাই রাজী হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রীপস্ সাহেব হোঁচট্ খেলেন মাত্র একটি জায়গায়। সেটি হচ্ছেন গান্ধীজী। ক্রীপস্ মিশনের প্রস্তাব শুনে গান্ধীজী হাসতে হাসতে বললেন, 'যুদ্ধে যে তোমরা জয়ী হবেই এমন কোন গ্যারান্টি আছে কি? এতো দেখছি—'A Post-dated cheque on a Crashing Bank'। গান্ধীজীর এ কথার উত্তর দিতে পারলেন না ক্রীপস্ সাহেব।

তবুও একদিন সর্ব্বদলীয় নেতাদের নিয়ে সিমলায় বৈঠক বসল। প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা ভাল ভাবেই হোল। কিন্তু শেষে সিট নিয়ে বাঁধল গণ্ডগোল। জহরলাল যেই প্রস্তাব করলেন, 'কংগ্রেসের ছয়টি সিট থেকে ন্যাশানালিষ্ট মুসলিম কে একটি সিট দেওয়া হবে'। সেই লীগের মিঃ জিন্নার ঘোরতর আপত্তি। জিন্না বললেন, 'মুসলিম লীগই হচ্ছে ভারত মুসলিমদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। তাই মুসলিম পাঁচটি সিটেই লীগ মনোনীত সদস্য থাকবেন। আর কংগ্রেসের মনোনীত ছয়টি সিটেই থাকবে হিন্দু সিট'। জহরলাল ও জিন্না সাহেব দু'জনেই যে যার মতের একটুও পরিবর্ত্তন করতে রাজী হলেন না। এই মত বিরোধেই 'সিমলা বৈঠক' পণ্ড হয়ে গেল।

সিমলা বৈঠক পণ্ড হবার বিবরণ সকলে শুনে, কতক হিন্দু বললেন, কংগ্রেসের হিন্দু সিট থেকে ন্যাশান্যালিষ্ট মুসলিমকে একটি সিট দিলে মুসলমানদেরই তো মেজরিটি হবে। তার চেয়ে কংগ্রেস এখানে চুপ করে থাকলেই পারত। জিন্না সাহেব পরে বুঝতেন যে, আহম্মকের মত কি ভুলটাই তিনি করেছেন। ভিন্ন মতের হিন্দুরা বললেন, তা' কি কখন হয়? হিন্দু ও মুসলমানদের মিলিত প্রতিষ্ঠান এই কংগ্রেস। তাই দুই সম্প্রদায়ের মিলনের স্বার্থরক্ষা কংগ্রেসকে করতে হবে। এই কংগ্রেসের পত্তন সময় থেকে কত মহাপ্রাণ মুসলিম নেতার কতশত দান ও দেশ সেবার নিদর্শন রয়েছে, এই সঙ্গে আরো কত মুসলিম বড় বড়

নেতাদের ন্যাশান্যালিষ্ট পার্টি রয়েছে, বিশেষ করে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সীমান্তের গান্ধী আব্দুল গাফ্ফার খাঁন, আসফ আলি, রফি আমেদ কিদোয়াই এঁরা যেমন বিচক্ষণ তেমনই সাধুলোক, এঁদের সঙ্গে দেশ সেবায় আরো কত নিষ্ঠাবান মুসলিম নেতা কংগ্রেসে থেকে দেশের ও দশের মঙ্গল কামনায় আজীবন ত্যাগ স্বীকার করে আসছেন। এঁদের প্রতি তা'হলে ঘোরতর অন্যায় করা হবে তা'ছাড়া ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের মূল নীতির উদ্দেশ্যই পালটে যাবে। জিন্না সাহেব কি কম ঝানুলোক, একেবারে ঝুনো পলিটিশিয়ান্। কথার মার প্যাঁচে কেমন চাল দিয়েছেন। কংগ্রেস যেই ছয়টা সিট্ হিন্দুর সিট্ বলে মেনে নেবে, তখনই জিন্না জোর গলায় প্রমান করবেন যে কংগ্রেস ভারতের হিন্দু প্রতিষ্ঠান।

আবার মুসলিম ভায়েরা বললেন, একমাত্র মুসলিম লীগই মুসলমানদের রক্ষা করতে পারে। এই যে সিয়াপার্টি, খেলাফৎ পার্টি, লালকোর্ত্তাদল, আল্লামা মসরিকির খাগ্সার পার্টি, উলেমা পার্টি, আকালী পার্টি, কৃষান মজত্নর পার্টি, এদের সঙ্গে যখন মুসলিম লীগের যোগ নেই, এঁরা যখন জিন্না সাহেবের নিন্দা করেন, তখন বেশ বুঝা যাচ্ছে যে, মুসলিমদের স্বার্থরক্ষা করতে এঁরা মোটেই চান না। কাজেই এঁদের কংগ্রেসের তাঁবেদার পার্টি বলা চলে। এই তো আমাদের সাধারণ ভারতীয়দের আলোচনার মতামত। অথচ পরস্পর সকল বিরোধী দলের নেতাদের সকলকে পার্টি গড়ার উদ্দেশ্য বিষয়ে প্রশ্ন করো, উত্তরে সকলেই বলবেন যে, আমাদের পার্টি গড়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হল ভারতকে শৃঙ্খলমুক্ত করা। মানে সব পার্টিরই উদ্দেশ্য এক। তাই বলব, অভিজ্ঞ দেশ নেতাদের কাছে দেশের লোকের রুচি ও প্রকৃতির বিভিন্নতা যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন রুচির দলও একে একে গড়া হয়েছে যথাযথভাবে। এইসব বিভিন্ন প্রকৃতির দলগুলি যেন এক একটি জাতি সংস্কারের মেসিন। এ ছাড়া নানা মতাবলম্বী দল থাকায় সাধারণ লোকের বিচার শক্তির জ্ঞান বাড়ানোর বেশ সাহায্য করা হয়েছে। বাধ্য করান

হয়েছে যেন সকলকে বুঝে দেখতে যে, কোন দল, দেশ ও জাতির পক্ষে শুভ বা অশুভ তা' তোমরা নিজেদের স্বাধীন মন দিয়ে বুঝে দেখার চেষ্টা কর।

এইসব বিচারের চিন্তায় পড়ে আমাদের যখন মনুষত্বের চৈতন্য হবে, তখন এসব দলগত বিরোধী মতের জনপ্রতিষ্ঠানগুলি আপনা হতেই একে একে তিরোহিত হয়ে যাবে অথবা দেশের প্রয়োজন মতে সরকার প্রতিষ্ঠান গুলির সংস্কার সাধনে ব্রতী হবেন। দল বিরোধী নেতারা জন সমাজের কাছে আজ সাময়িকভাবে নিন্দনীয় হলেও পরে এঁরাই হবেন কিন্তু আমাদের সমাজ বিষের 'বিষ পাথর'। সহসা রাস্তায় একদল লোক হৈ চৈ করে ছুটে যাচ্ছে শুনে সকলে সন্ত্রাসের সঙ্গেই উঠে পড়লুম।

দ্বাদশ পর্ব

ভারত ছাড় আন্দোলন ও বেঙ্গল ভলিণ্টিয়ার্স

গান্ধীজী ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রথম করেন Non Violence Movement (১৯২০) দ্বিতীয় আন্দোলন করেন Civil Disobedience Movement (১৯৩০) তৃতীয় আন্দোলন করেন Personal Civil Disobedience Movement (১৯৩২) এবার চতুর্থবারের আন্দোলন সংগ্রাম করবেন Quit India Movement 'ব্রিটিশ ভারত ছাড়' (১৯৪২) ।

অনেক আগে থাকতেই সকলের মুখে মুখে প্রচার হচ্ছিল, বিয়াল্লিশের আগষ্ট মুভমেণ্ট খুব জোরদার হবে। এ সময় এদেশে বৈদেশিক আক্রমন ভীতি প্রবল হয়। জাপানীর সৈন্য ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে শোনা যাচ্ছে। শহর ছেড়ে জাপানী বোমা পড়ার ভয়ে শহরবাসীরা বাড়ী ঘর ফেলে রেখে পল্লীর ভেতরে গণ্ডগ্রামের মধ্যে চলে যাচ্ছেন। এখন শহর প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। গ্রামের চাষীদের উদ্বাস্তু করে সরকার সেখানে সৈন্যদের ছাউনি ফেলেছেন। নৌকা ও সাইকেল সকলের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। চারিদিকে ব্ল্যাক আউটের অন্ধকার আর সামরিক বাহিনীর তৎপরতা বেড়ে চলেছে। শহরের আশে পাশে বহু ট্রেঞ্চ্ খোঁড়া হয়েছে, বিমান আক্রমন থেকে রক্ষা পাবার জন্যে।

এদিকে তখন ক্রীপস্ প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়ায় ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হল। গান্ধীজী বললেন, ভারতে বৃটিশ শাসনই জাপানকে ভারত আক্রমনে প্রনোদিত করবে। ইংরাজ ভারত হতে সরে গেলে ভারতের বিপদ কাটবে। গান্ধীজী তাঁর 'হরিজন পত্রিকায়'

ব্রিটিশ সরকারকে ভারত ত্যাগ করে চলে যাবার জন্যে অনুরোধ পত্ররূপে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। কংগ্রেসের বিরোধী দলেরাও এতে সম্মতি জানালেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর মিটিংয়ে 'ইংরাজ ভারত ছাড়' প্রস্তাবটি ১৪ই জুলাই (১৯৪২) সর্ব্ব সমর্থন লাভ করে।

২৮শে জুলাই (১৯৪২) সুদূর থাইল্যাণ্ড থেকে ভারতে আকাশ বাণী হ'ল। ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বোস এক মর্ম্মস্পর্শী আবেদন জানালেন।

'দিন আগত ওই। আপনারা ভারতবাসী সবাই দলে দলে যোগ দিন, গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে। মনে রাখবেন, জাতীর জীবনে এমন সুযোগ বার বার আসবে না'।

এই বিপ্লবী রাসবিহারী বোস দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ কালে বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ায 'মুক্তি ফৌজ' গড়ে তোলার প্রস্তুতির পর (১৯৪২) ২৫শে এপ্রিল নিজে নিজেই আনন্দে জোর গলায় বলে উঠেছিলেন 'আমি ছিলুম সংগ্রামী। আর একটি সংগ্রাম আমি চাই। এবং সে সংগ্রাম হবে শেষ ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম'।

৮ই আগষ্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর দ্বারা ১৪ই জুলাইয়ের কংগ্রেস কমিটীর সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হল। এবং গান্ধীজীকে গণ আন্দোলন পরিচালনা করবার যাবতীয় ক্ষমতা প্রদান করা হল। এই সর্ব্ব সমর্থিত প্রস্তাবটি 'quit India' বা 'ভারত ছাড়' নামে খ্যাত। গান্ধীজীর ওপরে এর সমস্ত ক্ষমতা অর্পনের পর হতেই, শুরু হল গান্ধীজীর ঐতিহাসিক ৯ই আগষ্ট 'আগষ্ট মুভ্‌মেন্ট'। ভারতের সর্ব্বত্র সবার মধ্যে কর্ম্ম চাঞ্চল্য দেখা গেল।

বৃটিশ সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করলেন ব্যাপক ধরপাকড়। ৯ই আগষ্ট গান্ধীজী, জহরলাল সমেত ওয়ার্কিং কমিটীর সমস্ত সদস্যকে বোম্বাই শহরে গ্রেপ্তার করা হল। বন্দী হবার সময় গণ সংগ্রামের অধিনায়ক জাতির উদ্দেশ্যে বানী দিয়ে যান 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' মহানায়কের এই মহা বানী

ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অভাবনীয় উন্মাদনার সঞ্চার করল। অগনিত মুক্তি সেনার প্রাণে 'মৃত্যু পণ' জাগিয়ে তুলল। প্রচণ্ড ভাবে শুরু হল আগষ্ট বিপ্লব। সহস্র সহস্র মানুষ নেতৃহীণ অবস্থায় এক দারুণ আন্দোলনের প্রবাহ সৃষ্টি করলেন। সরকারী সম্পত্তি, রেলপথ, তার, ডাক, থানা বিনষ্ট করা আরম্ভ হয়ে গেল।

সরকার অত্যাচারের চণ্ড নীতি দেশের চারিধারে আরম্ভ করলেন। আন্দোলন দমনের জন্যে প্রায় একলক্ষ লোককে গ্রেপ্তার করা হল। এতেও আন্দোলন থামছেনা দেখে, ব্রিটিশ ক্ষিপ্ত হয়ে মুক্তি সেনাদের মৃত্যু ঘণ্টা বাজাতে শুরু করে দিলেন। লাঠি, বেয়োনেট, গুলি চালনা শুরু হল। গুলি বর্ষনে নিহত হল ১০২৮ জন ও আহত হলেন প্রায় ৩২১৫ জন। এ হিসাব সরকারী হিসাব। বৃটিশের এ হেন অত্যাচার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

সুদূর থাইল্যাণ্ড থেকে রাসবিহারী ক্রুদ্ধ হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শোন, আমার দেশবাসী ভাইদের তোমরা নির্ব্বিচারে আগের মত গণহত্যা ও নেতা হত্যা করবে, আর আমরা তা' শুধু নির্ব্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখব তা' তোমরা স্বপ্নেও মনে করনা। মনে রেখো, আমরা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতীয়গণ চুপ্ করে বসে নেই। সেই দিন এই অত্যাচারের রক্তের ঋণ তোমাদের রক্তের বিনিময়ে শোধ দিতে হবে'। রাসবিহারীর ভীতিপ্রদ হুঙ্কার শুনে চতুর বৃটিশ আগের মত নেতা হত্যা বা গণ হত্যার নিধন যজ্ঞ করল না এবং নৃশংস অত্যাচার ও কিছু হ্রাস করল।

আগষ্ট মুভ্মেণ্টকে জোরদার করে দেশে বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে তোলার জন্যে (১৯৪২) লীগের বোম্বে অধিবেশনে জিন্না বললেন, 'গান্ধীজীর আগষ্ট আন্দোলন শুধু মাত্র বৃটিশের বিরুদ্ধেই নয়, মুসলমানদেরও বিরুদ্ধে'। কিন্তু এর পর থেকে সকল সম্প্রদায়ের মুখেই এক কথা 'ইংরাজ ভারত ছাড়'। সর্ব্বত্র একই আন্দোলন। শহরে ও গ্রামে সকলেই

জীবন পন করে বৃটিশ তাড়াবার কাজে উঠে পড়ে লেগে গেলেন।

আগষ্ট আন্দোলন পুরাদমেই চলছে। ১৫ই নভেম্বর (১৯৪২) জলন্ধর থেকে জিন্না ঘোষণা করলেন, 'যে কোন বুদ্ধিমান লোক বুঝতে পারবেন যে, হিন্দু নেতা মিঃ গান্ধীজীর এই আগষ্ট আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল মোট দু'টি। (এক) যুদ্ধে বিপদগ্রস্থ ইংরেজকে ভয় দেখিয়ে কংগ্রেসের দাবী মেনে নিতে বাধ্য করানো, আর (দুই) সেই দাবীর জোরে গোটা মুসলিম সমাজকে ধ্বংস করা। সরকারের যদি কোন শুভ অভিপ্রায় থাকে, তবে অনায়াসেই তাঁরা এই বিপদের সময় ভারতের দশ কোটি মুসলমানের বন্ধুত্ব পেতে পারেন। 'আমরা বন্ধুত্ব করতে প্রস্তুত'।

সরকার এত আশার কথা শুনেও দুশ্চিন্তায় একেবারে নীরব। বৃটিশ বোধহয় জিন্নার এই রাজনীতির বড় রকমের চালটি ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই জিন্নার প্রতি মোটেই আস্থা আনতে পারেন নি।

(১৯৪২) ডিসেম্বর মাসে করাচিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে ব্রিটিশ শাসকদের উদ্দেশ্য করে জোরের সঙ্গে জিন্না বললেন, 'বৃটিশ! দেশ ভাগ কর ও ভারত ছাড়' 'Divide & quit'। সব দলই ব্রিটিশকে ভারত ছেড়ে যেতে বলছে। এ কথা সকলে শুনে দেশের লোকের মনে আরো উদ্দীপনা বাড়ল। গ্রামে ও শহরে তখন বিক্ষোভের আগুণ জ্বলছে। বৃটিশ কিছুতেই কায়দা করতে পারছে না। সব বান চাল হয়ে যাচ্ছে।

এই আগষ্ট মুভ্‌মেণ্ট্‌কে কেন্দ্র করে ১৭ই ডিসেম্বর মেদিনী পুরের 'বিদ্যুৎ বাহিনী' তাম্রলিপ্ত স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। এই স্বাধীন সরকারের নাম ঘোষিত হবার সঙ্গে নজর করে দেখাগেল যে, এই নতুন সরকারের নিজস্ব সৈন্য ও পুলিশ বিভাগ, গুপ্তচর বিভাগ, কারা বিভাগ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বহিঃশত্রু আক্রমন হতে রক্ষা পাবার জন্যে চারিদিকে খাল খনন করাও হয়েছে। সর্ব্ব ক্ষেত্রে গভর্নমেণ্টের শাসন শোষন বন্ধ করে দিয়ে বৃটিশ সরকারকে একেবারে অচল করতে সক্ষম

হয়েছে এই বিপ্লবী মেদিনীপুর, একথা শুনে সকলেই আনন্দিত।

এমন সময় বরিশালের বাঘ বাংলার প্রধান মন্ত্রী এ, কে, ফজ্‌লুল হক্‌ কোথায় এক সভায় ভাষণ দিতে দিতে মেদিনী পুরের 'বিদ্যুৎ বাহিনীর' নতুন সরকারকে একটু মৃদু সমর্থন জানিয়ে ফেলে ছিলেন। জনাব হক্‌ সাহেবের এই ভাষণ শুনে বৃটিশ কর্তারা তো একেবারে রেগে লাল। কারণ, বৃটিশ সরকার নানা বিধ দমন নীতি চালিয়েও যেখানে দেশের বিদ্রোহ দমন করতে পারছেন না, নতুন নতুন অর্ডিন্যান্স জারী করতে হচ্ছে, সে সময় হক্‌ সাহেব গভর্নরের সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে, মেদিনী পুরে সরকারী তদন্ত কমিশন পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই একথা জানতে পেরে গভর্নর বাহাদুর অত্যাধিক রাগে জ্ঞান হারা হয়ে, স্বয়ং সরাসরি প্রধান মন্ত্রী হক সাহেবকে ডেকে কৈফিয়ৎ তলব করলেন। গভর্নর বললেন, 'আমরা যেখানে তদন্ত কমিশন পাঠাতে রাজী নয়, সে ক্ষেত্রে তুমি কার হুকুমে তদন্ত কমিশনের আদেশ দিয়েছ? তার লিখিত কৈফিয়ৎ দাও'।

প্রধান মন্ত্রী হক্‌ সাহেব এর কোন কৈফিয়ৎ দিলেন না। লাট সাহেবকে এভাবে উপেক্ষা করায় গভর্নর সাহেব হক্‌ সাহেবকে অনেক অপমান কর কথা শুনিয়ে ভয় দেখালেন। শ্যামাপ্রসাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রধান মন্ত্রী হক্‌ সাহেবকে এরূপ ভাবে অপমান করায় ডঃ মুখার্জী পদত্যাগ করলেন। তার পরে পদত্যাগ করলেন জনাব ফজলুল হক্‌।

নিশীথ এসব কথা শুনতে শুনতে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে বললে, 'মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন শুনে, আমার সেই পার্কসার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনের কথা মনে পড়ছে। সে কি উদ্দীপনা। লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌, লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌, লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌ করে, তালে তালে পা ফেলে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে হাজার হাজার তরুণ যুবক। এগিয়ে চলেছে সুসজ্জিতা নারী বাহিনী, এগিয়ে চলেছে অশ্বারোহী বাহিনী, এর পর চলেছে মোটর সাইকেল বাহিনী,

মেডিক্যাল কোর বাহিনী, এর সঙ্গে এগিয়ে চলেছে সহস্র সহস্র পদাতিক সৈনিকের দল। স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রস্তুতির ইতিহাসে সুভাষের এক অবিস্মরনীয় সৃষ্টি 'বেঙ্গল ভলিন্টিয়ার্স'।

দেশের লোক এসব দেখে উৎফুল্ল-উচ্ছসিত। কি সংবাদ পত্র, কি ভারতের নেতৃবৃন্দ, সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হ্যা, এইতো চাই, এইতো করা উচিত, এমনি নিয়ম শৃঙ্খলাইতো দেশের লোকদের শিখতে হবে। সুভাষ দেখালে বটে। ছেলে, বুড়ো সকলে খুশিতে ফেটে পড়ছে। সত্য বললে, শুধু খুশী হতে পারলেন না একজন, তিনি হলেন অহিংস মন্ত্রের ঋষি গান্ধীজী। বোধ হয় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের রোষ দৃষ্টি এ্যাড়াবার জন্যেই সব দেখে শুনেও গান্ধীজী বললেন, 'এ হচ্ছে পার্ক সার্কাসের সার্কাস'। একটা যেন বিদ্রূপ পূর্ন হাস্য কর ব্যাপার।

নন্দদা বললে, শোন তবে আর এক ঘটনার কথা বলি। কংগ্রেস এক সময় সুভাষ বাবুর বিরুদ্ধে 'ব্যান' দিয়ে রেখেছিলেন। তখন স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে এই 'ব্যান' তুলে নেবার জন্যে একটি অনুরোধ-পত্র পাঠান। এতেও ব্যান তুলতে রাজী হলেন না গান্ধীজী। বরং বললেন, **'I Feel This Subhas is behaving a spoil■ child'** অর্থাৎ বললেন, সুভাষ বকাটে ছেলে। নইলে অমন আই, সি, এসের সুখের চাকুরী ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এই দুঃখ-কষ্ট-ভরা অনিশ্চিত জীবন কেউ মেনে নেয় কখনও?

নিশীথ বললে, অথচ 'জাতির জনক' বলে গান্ধীজী আজ সর্ব্বত্র পূজিত। এই বিশেষনটি কিন্তু ঐ বকাটে ছেলে সুভাষেরই দেওয়া। সত্য বললে, মহাত্মাজীর সঙ্গে সুভাষের ভালো সম্পর্ক না থাকলে, ঐতিহাসিক মহা সংগ্রাম শুরু করার আগে ব্রহ্ম রণাঙ্গন থেকে বেতার যোগে কেউ কি বলে যে, **'Fother of our nation ! in This Holy War for India's libaration, We ask for your blessings and goodwishes'**। সত্যর কথা শুনে সকলে একটু বিস্ময়ের

হাসি হাসল।

অমিয় বললে, সত্যি যদি কারো কৃতিত্ব থাকে তো সে হচ্ছে সুভাষ বাবুর 'আজাদী সংগ্রাম'। তাই নেতাজীকে নিয়ে দেশময় হুলুস্থুল পড়ে গেছে। কেউ বলে সুভাষ বাবু দ্বিতীয় হিট্‌লার, কেউ বলে ষ্ট্যালিন, কেউ বলে সাধক বিবেকানন্দ। প্রফুল্ল বললে, দেখুন। নেতাজী যেমন বড়, তেমন বল্লভভাই প্যাটেল, জহরলাল, লিয়াকাৎ আলি, জিন্না সাহেব ও মহাত্মাজীকে নেতাজীর চেয়ে ছোটইবা বলি কেমন করে? এঁরা সব এক যোগে না লাগলে ফৌজীদের কেউ বাঁচতো? অমিয় বললে, আজাদ হিন্দ ফৌজীদের পক্ষ না নিলে কংগ্রেস্ই বাঁচতো না। তাই কংগ্রেসকে বড় করে তোলবার জন্মে নেতৃবৃন্দের এত তৎপরতা। সত্য বললে, যদি কিছু মনে না কর তো দু'একটি অপ্রিয় সত্য বলি। দেখ, তোমাদের মত দেশের লোককে আমার আর জানতে বাকি নেই। ওই সাধক সুভাষ বাবুকে একদিন জোচ্চোর বলতে তোমাদের মুখে আট-কায়নি। মনে আছে, ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের কনফারেন্স, রাজতন্ত্রবিদ্ মতিলাল নেহেরু হলেন কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি। অধিবেশনে যোগদানকারী জে, এম, সেনগুপ্ত, ভি, জে, প্যাটেল, লালা লাজপত রায়, আব্বাস তায়েবজী আরো বহু বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত। ৩৪টি অশ্ববাহিত যানে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, সঙ্গে সামরিক কায়দায় স্বেচ্ছা সেবিকা ও স্বেচ্ছা সেবক বাহিনীর বিরাট মিছিল। শহরের মানুষ ও কুল-নারীরা অপূর্ব্ব উৎসাহে রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে। গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি ও রাজ পথে পুষ্প বষন করলেন। সর্ব্বাধিনায়ক সুভাষ বাবু G. Q C রূপে মিছিল পরিচালনা করে, সামরিক শৃঙ্খলার সঙ্গে সকলে যথা স্থানে এলেন।

এই কনফারেন্সের 'বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স' আর্গানাইজ করবার জন্যে সুভাষ বাবু দিন রাত দলবল নিয়ে খেটে, ধনীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে টাকা তুলে নিয়ে এলেন। সেই টাকা স্বেচ্ছাসেবকদের পঞ্চাশ হাতে খরচ হল।

পরে হিসাব মেলাতে গিয়ে কিছু টাকা হিসাবে মিললো না। এর উত্তরে চুপি চুপি বলাহল কিনা 'ওই গরু সুভাষ বাবু চোর'। অপরাধ তিনি নিজে হাতে টাকা তুলে এনেছিলেন, এইতো ?

তাই বলি সব পণ্ডিতের দল এ কথাটা বোঝনা কেন যে, কোন বিরাট কাজ মাত্র কয়েক জনে সম্পন্ন করতে গেলে একটু যে ত্রুটি থেকে যাবেই, এ আর তোমাদের মাথায় আসেনা ? তোমরা কখনো এগিয়ে এসে কোন কাজের দায়িত্ব নেবেনা, শুধু যে যার স্বভাব অনুযায়ী নিজের মনগড়া বিচার করে জোরাল এক রায় দিয়ে দেবে। এদের মত কাণ্ডজ্ঞান হীন পাবলিককে কি বলতে ইচ্ছে করে বীরেনদা ?

আমি হাসতে হাসতে বোধহয় বললুম 'নুইস্যান্স ব্যাকটিরিয়া'। সকলে উচ্চ হাস্য করে উঠে পড়া হল।

ত্রয়োদশ পর্ব্ব

রসিদ আলির মুক্তি দিবস পালন

সকলে এক জায়গায় বসে আছি। সন্ন্যাসী বললে, 'সুভাষ বাবু আজ ইহলোকে না পরলোকে তার সঠিক খবর কিন্তু কেউ জানি না।'

নিশীথ বললে, সুভাষ বাবু অবশ্যই কোথাও বেঁচে আছেন। কেননা, মহাত্মাজী বলেছেন যে, 'সুভাষের শ্রাদ্ধকার্য্য যেন না করা হয়'। তাই মনে হয় যে, ভারতের জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্খা পূর্ন করার জন্যে নেতাজী তাঁর নিজের জন্মভূমি ভারতবর্ষে নতুন উদ্যমেই ফিরে আসবেন ও সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ে এক নতুন জাতির পবিত্র ভারত সৃষ্টি করবেন।

অমিয় হেসে বললে, একটা মন গড়া কথা বললেই হোল। সুভাষের খবর গান্ধীজী জানবেন কেমন করে? গান্ধীজীর সঙ্গেতো সুভাষের খু-উব প্রীতির সম্পর্ক?'

শচীনদা বললে, 'কেন? মহাত্মাজীতো সকল নেতার বাপুজী। ইনিই তো আমাদের জাতির পিতা। মনে নেই, যখন মাতা কস্তুরবা গান্ধী পরলোক গমন করেন, তখন নেতাজী তাঁর স্বাধীন ভারতের স্বাধীন পতাকা অর্দ্ধনমিত রেখে, সমস্ত ফৌজীদের সামনে কি বলে শোক প্রকাশ করে ছিলেন?'

সুভাষ বাবু তাঁর অশ্রুসিক্ত নয়নে গদগদ স্বরে কাতর কণ্ঠে বলেছেন, 'আজ ভারতের অতীব দুর্দ্দিন। আমাদের মাতা কস্তুরবা ইহলোক ত্যাগ করে পরলোক প্রাপ্তা হয়েছেন। আমি তাই এখান থেকে আমাদের জাতির পিতা মহাত্মাজীকে আমার অন্তরের সমবেদনা জানাচ্ছি। এর সঙ্গে আরো জানাচ্ছি আমার প্রতি ভারতবাসী ভাইকে তাঁরা যেন

বাপুজীকে সান্ত্বনা দান করেন ও মহাত্মার যাতে কোন কষ্ট না হয়, সেই ভাবে তাঁর প্রতি সকলে যেন দৃষ্টি রাখেন।'

নিশীথ বললে, 'ভারতের এখন খুব দুঃসময় বলতে হবে। একদিকে ভারতের বাইরে থেকে আজাদী ফৌজ নিয়ে নেতাজীর 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' আর গান্ধীজীর ভারতের মধ্যে থেকে 'ভারত ছাড় সংগ্রাম' দু'টোই না থেমে যায়।'

পাঁচুদা বললে, 'ভারত ছাড় আন্দোলন থামবে কি? এ আন্দোলনকে আরো জোরদার করতে মিঃ জিন্না লীগ সমর্থক 'রসিদ আলি মুক্তি দিবস আন্দোলন পালনের আহ্বান জানিয়েছেন। সময় মত রসিদ আলি মুক্তি দিবস আন্দোলন শুরু হল। চারিদিকে গণ-বিক্ষোভ আরো প্রবল আকার ধারণ করল। হিন্দু-মুসলিম এক যোগে রাজপথে শোভাযাত্রা বার করল। রামেশ্বর ব্যানার্জ্জী ও মহম্মদ সালাম পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েও রসিদ আলিকে মুক্তি দেওয়াতে পারলে না।'

অমিয় বললে, 'রসিদ আলি যখন লীগকে সমর্থন করে, তখনই জানি এর কারাদণ্ড অনিবার্য্য। কেননা, প্রথমতো লীগের ভাল কৌসুলীর অভাব, দ্বিতীয়তঃ মিঃ জিন্না ভারতের অবনতিই চান। হিন্দু-মুসলমানের মনে সাম্প্রদায়িক মনোভাব জিইয়ে রাখার জন্যেই পাকিস্তানের দাবী।'

নিশীথ বললে, 'জিন্না সাহেবের পাকিস্তান দাবী যে, নিছক একটি রাজনৈতিক চাল তা'তে অবশ্য কোন সন্দেহ নেই। তবে লীগ নেতা যতই সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ করুন না কেন, কাজের সময় মিঃ জিন্না চুপ্ করে থাকেন। রসিদ আলি মুক্তি দিবসে ইস্‌লামিয়া কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা লীগের পক্ষে যখন আন্দোলন আরম্ভ করলে, তখন অন্যান্য সকল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা একযোগে সব ঝাণ্ডা এক করে কলকাতা ও বম্বের রাজপথে ঘুরে বেড়াল। ট্রামগাড়ী, মিল, ফ্যাক্টরী, বাজার, দোকান, ট্রেন পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিলে। দিকে দিকে লুট-পাট, গাছফেলে রাস্তা বন্ধ, পোষ্ট অফিস জ্বালানো, ভারতীয় সাহেবদের সুট্ খুলিয়ে ধতি

চাদর পরানো, বিদেশী মহিলাদের লাঞ্ছিতা করে, হিন্দু-মুসলিম একযোগে যখন চট্টগ্রামের প্রতিশোধ নিতে লাগল, কই তখনতো লীগ থেকে জিন্না একবারও বললেন না যে, হে-ভারতের মুসলিম! তোমরা ভিন্ন দলের সঙ্গে আন্দোলন করে অন্যায় করেছ। তোমরা এধরণের আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াও।'

সত্য বললে, 'তাই মনে হয়, দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার করার জন্যে লীগ রসিদ আলির বন্দী ব্যাপারকে এত ঘোরাল করেছে। নইলে, সকল আজাদী ফৌজীরা একই অপরাধে অপরাধী হয়ে আইন-কানুন সাহায্যে প্রায় সকলেই মুক্তি পেলেন আর তাঁদের মুক্তির নথিপত্তর দেখেও 'লীগ' রসিদ আলিকে মুক্তি দেওয়াতে পারল না। এছাড়া মহাত্মাজী যেমন করে সরকারের কাছ থেকে ডঃ পবিত্র রায়, হরিদাস মিত্র প্রভৃতির জীবন ভিক্ষা করে নিলেন, তেমন করে মিঃ জিন্না রসিদ আলিকে কারাদণ্ড থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারতেন না? ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে মিঃ জিন্নার কি কোন পরিচয় ছিল না?'

নন্দদা বললে, ঠিক কথা। আমরা শুনেছি-এই মিঃ জিন্না এককালে লণ্ডন শহরে প্রিভি কাউন্সিলের মাথাওলা বৃটিশ আইনজ্ঞদের 'কন্‌সালটান্ট' রূপে প্র্যাকটিস করতেন। এর ওপর স্যার জাফরুল্লা প্রভৃতি নেতা যখন মুসলিম লীগে সক্রিয় অবস্থায় বর্তমান, তখন লীগের মধ্যে ভাল কৌসুলীর অভাবটা কোন খানে? তাতো নয়, আসল কথা হচ্ছে আন্দোলন, চাই আমরা স্বাধীনতা।

নিশীথ বললে, 'স্বাধীনতার জন্যেই ভারত চায় স্বাধীনতা। দেশের কল্যাণকে সকল দিক্ থেকে স্বাধীন ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাষ্ট্রশক্তিকে করায়ত্ত করতে হবে। এই জন্যেই প্রয়োজন হয়েছে আন্দোলন যাকে বলে 'বিপ্লব'।

স্বাধীন চেতা নায়কেরা বলেন, স্বাধীনতার একটা নিজস্ব বিশেষ মূল্য আছে। সে কারণ দেশে বিপ্লব আনতে কবি কাব্য রচনা

করেন, সাহিত্যিক দৃঢ় হস্তে লেখনী ধরেন, দেশকর্ম্মীগণের আরাম তুচ্ছ করে, অবর্ননীয় দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ করতে এগিয়ে আসেন ও স্বেচ্ছায় প্রাণ দিয়ে শহীদ হন।

দেশবন্ধু বলেছেন, 'আমাকে স্বাধীনতা দাও, নয় আমাকে মৃত্যু দাও'। দেশবন্ধুর প্রিয় শিষ্য সুভাষ বলেছেন, 'তুম্ হামকো খুন দো- হাম তুমকো আজাদী দুঙ্গা'। এ শুধু ভাব প্রবণ বাঙ্গালীর মুখের কথাই নয়। এটা অন্তরের মর্ম্মস্থানের কথা। তাই বাঙ্গালী দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যে হাসি মুখে দেশ ত্যাগ করেছেন। ফেরবার নৌকা পুড়িয়ে দিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

ভগীরথের গঙ্গা আনার মত দেশের স্বাধীনতা আনতে নেতাজী দুর্গম পথে সেই যে গেলেন, এখনও ফিরলেন না। এসবই প্রত্যক্ষ সত্য ও মুমুক্ষু ভারতের গৌরবময় ইতিহাস। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের মহাযজ্ঞের সহস্র সহস্র যোদ্ধা যাঁরা মৃত ও জীবিত, শুধু তাঁদের মনেই নয়, অতিসাধারণ ভারতীয়দের মনেও সব সময় একটা প্রশ্ন জেগেছে যে, আমরা এত ক্ষতির বিনিময়ে স্বাধীনতা চেয়ে বেড়াচ্ছি কেন?

এক দিন এর সঠিক উত্তর ধ্বনিত হ'ল। সে কথা বলেছেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তপঃক্লিষ্ট প্রধান সেনাপতি জাতির পিতা মহাত্মাগান্ধী। তিনি বলেছেন, 'মাত্র স্বাধীনতাই আমাদের শেষ লক্ষ্য নয়। শেষ লক্ষ্য হচ্ছে-ভারতবর্ষের-সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ। আর সে কল্যাণ স্বাধীনতা ছাড়া আসতে পারেনা। তাই এত ক্ষতির বিনিময়ে চাই আমরা স্বাধীনতা। স্বাধীনতা ছাড়া আমরা কেউ মানুষের মত বাঁচতে পারব না। কংগ্রেস তাই আরম্ভ করেছে তার শেষ বিপ্লব 'আগষ্ট আন্দোলন'।

এর পর মুসলিম লীগ আরম্ভ করলে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'। আন্দোলনের শুরুতেই বিভৎস কাণ্ড। ১৯৪৬-এর ১৬ই আগষ্টের পূর্ব্ব ঘোষিত মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ফলাফল এবং কলকাতা মহা

নগরীতে তার প্রতিরোধ ব্যবস্থার কোন প্রস্তুতিই ছিল না। কলকাতার সংখ্যাধিক্য হিন্দু ওই দিন অকস্মাৎ দেখল লীগের প্রলয়-নৃত্য। নোয়াখালিতে নৃশংস সাম্প্রদায়িক হত্যা, একেবারে অরাজক। লীগের এই দাঙ্গার ফলে বৃটিশের সকল শাসন ব্যবস্থা, সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলা রক্ষা, কোর্ট, কাছারী, থানা, পোষ্টাফিস সবই হোল প্রায় অচল— বিকল— বিলুপ্ত।

নেতৃস্থানীয়েরা অনেকে মনে করছেন, এস্ত-সংযত আলোড়ন হয়তো হতে পারে আমাদের জাতীয় জীবনের এক যুগ-সন্ধিক্ষণ। তাই রাষ্ট্রিক, সামাজিক, ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিদিন ধাপে ধাপে কেমন এক একটি রেখাপাত করে চলেছে। অথচ আমরা সাধারণ মানুষ অবাক হয়ে ভাবছি যে, আজ দেশের একি অবস্থা ? সাধারণ ভারতবাসীদের মনে তাই আজ প্রশ্ন জেগেছে যে, এই জন্যই কি করা হয়েছিল কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন, মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা, পরিষদ গৃহে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের বোমা নিক্ষেপ, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা, প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরামের ফাঁসি, যতীন দাসের নির্ভীক আত্মত্যাগ, মাষ্টার দা সূর্য্য সেন ও বাঘা যতীনের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, কংগ্রেসের নরম পন্থী ও চরম পন্থীর শক্তি পরীক্ষা, রাসবিহারী ও সুভাষ বোসের মাতৃভূমি ত্যাগ, জহর লালের বৈপ্লবিক বাণী, ভারত নেতাদের পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রাম। আজ কোথায় গেল সে সকল আদর্শ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা, কোথায় গেল সে সব পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি ? দেশের দুঃস্থ নিস্বঃলোকের প্রতি শক্তিমানের আজো তো রয়েছে দাম্ভিক পদক্ষেপ ও নিষ্পেষিত সমাজ জীবনের আজো। রয়েছে মর্ম্মান্তিক বোবা কান্নার নীরব যন্ত্রনা, এর উপশম করার কোথায় গেল সাংবিধানিক চরম ব্যবস্থা ? অথচ ভারতের চিন্তা জগতে নব-জাগরণের পীঠভূমি আমাদের এই কলকাতা। উনবিংশ শতাব্দীর লোক-নায়কগণ এই মহানগরী হতেই পরাধীনতার মুক্তি ও কু-সংস্কারের সমাজ

যথা সংবিধানে ভোটাধিকার, ধর্ম্মীয় সমান অধিকার জাতি বৈষম্য ও অস্পৃশ্য প্রভাব বর্জ্জন, নারীর মুক্তি প্রভৃতির মৌলিক অথচ অপরিহার্য্য পবিত্র অধিকারগুলির আজ যতটুকু এই অজ্ঞ দেশের মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করেছে ততটুকুই এই বাংলার চিন্তাশীল নায়কদের শতাব্দী ব্যাপী প্রচেষ্টার ফল। এই কলকাতা মহানগরীই তাঁদের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র। জ্ঞানের প্রসার এবং স্বাধীনতার মহৎ আন্দোলন ও এই কলকাতা মহানগরীরই সৃষ্টি।

তাই আজকের কলকাতার দাঙ্গাকেও মনে হচ্ছে যে এও যেন স্বাধীনতা কায়েমের আর এক নতুন রাজনীতি। বহু দুঃখ, যন্ত্রনা, লাঞ্ছনা ভোগ করা সত্ত্বেও বাংলা তথা ভারতের স্বাধীন সত্ত্বা আজও নষ্ট হয়ে যায়নি। তার অতীত গৌরবময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আজও সাগ্রহে অপেক্ষমান। আর তারই পবিত্র মহান অভিযান নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব বহণ করে চলেছেন আমাদের বর্ত্তমান প্রধান সেনাপতি মহাত্মা গান্ধী ও এঁর সহকারী লীগ নেতা কায়েদে আজম জিন্না।

স্বাধীনতা সংগ্রাম আলোচনায় বারে বারে গান্ধী-জিন্না নাম দেখে কোন কোন পাঠক হয়তো কিছু বিরক্ত হ'তে পারেন। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের গল্প লিখতে এঁদের কথাই এসে পড়ছে। কারণ এঁদের দু'জনকে বাদ দিলে স্বাধীনতা সংগ্রামের সুপরিকল্পিত নির্ভুল নেতৃত্বের কথা যেমন বলা হবেনা, তেমন স্বাধীনতা পাবার শেষের গল্পটাও জানা যাবে না।



চতুর্দ্দশ পর্ব্ব

কলকাতায় হাঙ্গামা

আজ ভোরে সপরিবারে আমরা বাড়ী ফিরেছি। প্রথমেই গেলুম ঠাকুর ঘরে, গৃহদেবতাকে প্রনাম করতে। প্রনাম শেষে মনে পড়লো, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে। আজ বাড়ী ফেরার আনন্দে তাই সবাইকে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের গল্প বলতে আরম্ভ করলুম।

আমাদের গৃহদেবতা 'নারায়ণ শিলাটিকে' বুকে ঝুলিয়ে ভদ্রক থেকে পদব্রজে যিনি কলকাতায় এসে ৫২ নম্বর বাগবাজার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে গৃহদেবতা রূপে প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি হলেন আমাদের বাংলা গদ্য-সাহিত্যের শ্রষ্টা, ভাষার রাজা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ডঃ কেরী সাহেব সাদরে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়কে নিয়ে গিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগে দুইশত টাকা বেতনে প্রধান পণ্ডিত পদে নিযুক্ত করেন।

এঁর রচিত 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' ১৯৫ পৃষ্ঠার বই। এটি ছাত্রদের জন্যে লেখা হলেও, এর শিল্প মহিমা অনেক লেখকের মাথা দিল ঘুরিয়ে। আমাদের দুঃখ এই যে, বইটি যেদিন ছাপা হয়ে দিনের আলো দেখলো, তখন লেখক পরলোকে। তবে বইখানির খ্যাতি লেখককে সত্যি সত্যিই মৃত্যুঞ্জয় করলো। এই বইটির প্রভাবেই সংস্কৃত প্রভাবিত বাংলা গদ্যের সূচনা, অক্ষয় কুমারের হাতে খড়ি আর বিদ্যাসাগরের পরিপূর্ণতা।

সেকালে মৃত্যুঞ্জয় একটি নাম নয়, একটি চরিত্র। কি হিন্দু কলেজ, কি স্কুল বুক সোসাইটি—কোন অসুবিধা হলেই ডাক পড়ে মৃত্যুঞ্জয়কে। এঁকে না হলে ডঃ কেরী সাহেবের অনুবাদের কাজ এগোয়না। অন্ততঃ ঘণ্টা দুই তিন তাঁকে তাঁর চাই। এঁকে পেলে কেরীর লেখার কোন ভুল

ত্রুটি হয় না ও বেশ তড়ি ঘড়ি কাজ হয়। যাকে বলে 'সুপিরিয়ার এ্যাকুইরেসি'। এর প্রধান কারণ, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর এত অধিকার ছিল যে সে অধিকার সেকালে এ রকমটি কারোরই ছিল না। আর বাংলা রচনায় তাঁর যে সহজ সরল ওজস্বিতা এর জুড়ি ছিল না কোথাও। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির অতীব দুঃখের ও লজ্জার কথা যে, আজকের বাঙ্গালী সাহিত্য পাঠকের কাছে এ নাম একেবারেই বিস্মৃত। ব্যক্তি পরিচয় চাপা পড়ে গেছে কৌতুহলের অভাবে।

শহর কলকাতায় সেদিন তাঁর খুবই নাম ডাক। সেই মাহেন্দ্র মুহুর্ত্তে তাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়ে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার ফ্রান্সিস্ ম্যাক্‌নটেন্ তাঁকে আহ্বান জানালেন কোর্ট পণ্ডিত্যের কাজ নেবার জন্যে। মাইনে অনেক—সম্মান ও প্রভূত। কেরী সাহেব হাসি মুখেই ছেড়ে দিলেন বিদ্যালঙ্কার মশাইকে। ১৮১৬ সালে সুপ্রীম কোর্টে এলেন মৃত্যুঞ্জয়। বয়স তখন তাঁর ৫৪। প্রৌঢ় মানুষ।

তাঁর সুযোগ্য পুত্র রামজয় তর্কলঙ্কার হলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের দ্বিতীয় পণ্ডিত এবং পরে ইনিও সুপ্রীম কোর্টের হিন্দু দায়ভাগ বিভাগের প্রধান জজ্ পণ্ডিত পদে পিতার আসনেই অধিষ্ঠিত হন।

মৃত্যুঞ্জয়ের ৫২ নম্বর বাগবাজার ষ্ট্রীটে রাজবল্লভ পাড়ায় নিজ বাটীতে চতুষ্পাঠী ছিল। পনেরোজন ছাত্র উক্ত চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করত। এই চতুষ্পাঠীতে মৃত্যুঞ্জয় ও রামজয় বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন। তখন ন্যায় ও স্মৃতির ছাত্রের তুলনায় বেদান্ত চর্চ্চার ছাত্র কম হোত। এই চতুষ্পাঠীতে পণ্ডিত রামজয় তর্কলঙ্কারের নিকট ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতি অধ্যয়ন করেছিলেন। এবং ঈশ্বরচন্দ্র এই 'স্মৃতি শাস্ত্রে' কৃতিত্ব দেখিয়ে আইন সমিতির নিকট হতে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ ক'রেন ও পরে ইনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে আশী টাকা বেতনে পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এদিকে দেশের মধ্যে আবার 'সতীদাহ' বৃদ্ধি পাওয়ায় সহমরন বিরোধী আন্দোলনকারীগণ আবার সচকিত হ'লেন। এই সময় রাজা রামমোহন

রংপুর থেকে কলকাতায় মানিকতলার বাড়ীতে এসেছেন, স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্যে। রামমোহন এখানে এসে সতীদাহ নিরোধ আন্দোলনে যোগ দিলে আন্দোলন নতুন প্রাণ পেল। অবশ্য এ সময়ে রামমোহনের পেছনে এসে সর্ব্বশক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তৎকালীন বাংলার (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার) সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

রক্ষণশীল দল ও সহমরন বিরোধী দলের বিরোধ যখন তুঙ্গে ওঠে, তখন দু'দলের সর্ব্বসমক্ষে মৃত্যুঞ্জয় এগিয়ে এসে বলেন, 'কোন ধর্ম্মের শাস্ত্রগ্রন্থ নিরাপরাধ মানুষদের পুড়িয়ে মারবার নির্দ্দেশ দিতে পারে না।'

শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুঞ্জয়কেই এতটা সামনা সামনি এগিয়ে এসে একথা বলতেই হোল, কারণ তখনও সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে রামমোহনের প্রভাব খুব একটা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কথা তৎকালীন ধনী, দরিদ্র, শাস্ত্রকার ও রাজপুরুষদিগের সকলের কাছেই অপরিসীম মূল্যবান ছিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের হিন্দু শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের কথা রাজপুরুষদের অজ্ঞাত ছিল না। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি হিন্দুদের 'সহমরণ' সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের বিধান অনুসন্ধান করে জানাবার জন্যে মৃত্যুঞ্জয়কে অনুরোধ করেন। মৃত্যুঞ্জয় বহু শাস্ত্রমন্থন করে ইহার উত্তরে সংস্কৃত ভাষায় যা লিখে পাঠিয়েছিলেন, তার সারমর্ম্ম হল—'হিন্দুর সহমরণ প্রথা হিন্দু শাস্ত্রের অপরিহার্য্য বিধান নহে, ইহা ইচ্ছাধীন বিষয় মাত্র'।

সহমরণ বিষয়ে এই বলিষ্ঠ অভিমত ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সরকারের কাছে মৃত্যুঞ্জয় কর্তৃক প্রদত্ত হয়। এরপরে রাজা রামমোহন রায়ের সহমরণ বিষয়ক প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে। সহমরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন কালে রামমোহন রায় তাঁর প্রচারিত একখানি ইংরাজী পত্রিকায় মৃত্যুঞ্জয়ের এই অভিমত উদ্ধৃত করেন।

লণ্ডনে 'ফ্রেণ্ডস্ অফ ইণ্ডিয়া' মাসিক পত্রিকায় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের

অক্টোবর সংখ্যায় 'সতীদাহ' সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয়ের অভিমতের সারাংশ ইংরাজীতে মুদ্রিত করে প্রচার করা হয়েছিল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় লণ্ডন থেকে কলকাতায় এসে সোল্লাসে বলেন, 'প্রাচীনতম বাংলা ব্যাকরণ' লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে তার পাণ্ডুলিপির সন্ধান হয়েছে। এর লেখক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিখ্যাত পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। পুঁথিটির বিবরণ দেন (ইং ১৩।৬।৭০) পাণ্ডুলিপি খাতাটির নম্বর হচ্ছে এস ২৮৯৫এ। এটি ডঃ কেরীর সহযোগিতায় অধ্যাপক লাইডেনের সংগৃহীত। এই পুঁথিটির তিনটি অংশ—এক থেকে বাইশ হচ্ছে বাংলা ব্যাকরণ, ওড়িয়া ভাষায় ও ওড়িয়া অক্ষরে লেখা, উনচল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ পৃষ্ঠায় আছে সংস্কৃত, বাংলা প্রাকৃত আর ওড়িয়া শব্দ কোষ। এই বইয়ে যেসব বিষয় আছে, সেসব দরকারী ব্যাপার কোন বিদেশী পণ্ডিতদের বইয়ে নেই। মৃত্যুঞ্জয়ের মত পণ্ডিত, সংস্কৃত, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় এরকম জ্ঞান, ব্যাকরণ সম্বন্ধেও তাঁর পাণ্ডিত্য যার প্রমান তাঁর 'প্রবোধ চন্দ্রিকায়' রয়েছে। এ জ্ঞান ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের মধ্যে কারো ছিলনা। তা'ছাড়া তখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত-দের বই, এদেশের লেখকদের একেবারে নাগালের বাইরে ছিল। তাই মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসন' থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া কোন লেখকের পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

ডঃ মুখার্জ্জী বলেন, বাংলা ভাষার যথার্থ বাংলা ব্যাকরণ বলাযায় একে। মৃত্যুঞ্জয়ের এই বইটিতে ব্যাকরণের 'এসেনসিয়াল' যা'কিছু তার সবই আছে, তা'ছাড়া সংস্কৃত ভাষার দাসী বৃত্তি থেকে মৃত্যুঞ্জয় ভাষাকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। রামমোহনের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' অবশ্য অনেক দিক দিয়ে 'ম্যাচিওর'। ডঃ মুখার্জ্জী এই পাণ্ডু লিপিটিকে সম্পাদনা করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। নাম 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ'। শনিবার ৭ই জুন ১৯৭০ এশিয়াটিক সোসাইটিতে এক অনুষ্ঠানে ডঃ মুখোপাধ্যায়

মূল পাণ্ডুলিপির 'ফোটো ষ্ট্যাট্' কপি উপস্থিত অতিথিদের দেখান। এবং তিনি এই মুদ্রিত বইটি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়কে উপহার দেন।

পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি' বাংলা ভাষায় ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত ভারতবর্ষের প্রথম ধারা বাহিক ইতিহাস।

কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যোগ্যতর পাঠ্যপুস্তক অভাবে মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধ চন্দ্রিকা গ্রন্থটি মুদ্রণ পর পাঠ্য পুস্তকরূপে গ্রহণ করে গ্রন্থকারকে সম্মানিত করেছেন। এই হোল ভাষার রাজা মৃত্যুঞ্জয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

জলযোগ সেরে বসে আছি। কাগজ ফেরী করার আওয়াজ কানে গেল। খুব আগ্রহের সঙ্গে তাড়াতাড়ি কাগজ কিনে, হেডিংগুলোয় চোখ বুলিয়ে যেতে লাগ্‌লুম। প্রথমেই বড় বড় অক্ষরে লেখা জিন্না সাহেবের নাম আগে চোখে পড়ল। ওইটাই পড়ে যেতে লাগলুম। লীগ নেতা জিন্না সাহেব কৈফিয়ৎ তলব করেছেন যে 'কলকাতার হাঙ্গামার জন্য দায়ী কে?'

কাগজ পড়তে পড়তে থতিয়ে গেলুম। ভাবলুম জিন্না সাহেবের একথার অর্থ কি হতে পারে? তবে কি লীগ এ হাঙ্গামা করায় নি, না আইনের চোখ এ্যাডাবার জন্যে জিন্নার এটা পলিটিক্যাল চাল। এইভাবে চিন্তা করতে করতে পড়ে গেলুম সব।

কত রকমের দাঙ্গা লুণ্ঠন ও হত্যা, বোরখা পরিহিত দুর্ব্বৃত্ত পুরুষ দলের ব্যাপক নারীহরণ, সুন্দরী যুবতীদের ধরে নিয়ে গিয়ে উদম নৃত্য করানো, অকথ্য ধর্ষণ, শিশু হত্যা, ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড, মেয়েদের নিয়ে বিক্রীর জন্য বিদেশে চালান করা, নিরীহ গৃহস্থদের ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণ, আরো কত মর্ম্মন্তুদ্ ঘটনাই না ঘটে গেছে। পড়তে পড়তে দুঃখে মন ভারী হয়ে উঠল। বাড়ীর ভেতরে কাগজ পাঠিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লুম।

ঘুম কিছুতেই হল না। গভীর ভাবেই চিন্তা করতে লাগলুম জিন্না সাহেব তা'হলে কাকেই বা দায়ী করতে চান? কংগ্রেসকে? না তাতো নয়। তা'হলে কলকাতার মার মুখো জনতার মধ্যে সহিদ্ সুরাবর্দ্দি সাহেব গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে, কংগ্রেস নেতা শরৎ বোসকে বাঁচালেন কেন? আবার শরৎ বোস ওই ভাবেই সহিদ্ সুরাবর্দ্দিকে বাঁচিয়ে দেবার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? আর লীগ ও কংগ্রেসে সরাসরি দাঙ্গাইবা হলনা কেন? তবেকি হিন্দুরা এ হাঙ্গামা বাঁধিয়েছেন। জিন্না কি হিন্দুদের দায়ী করতে চান? কিন্তু এ হাঙ্গামা বাধিয়ে হিন্দুদের কি লাভ? বাংলার মুসলিম লীগ বা সহিদ্ সুরাবর্দ্দিকে দায়ী করতে লীগনেতা নিশ্চয়ই চাইবেন না। তবে কি জিন্না সরকারকে দায়ী করতে চান? জিন্না কি বৃটিশ সরকারকে দায়ী করতে চাইবেন।

এদিকে বাংলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব এ, কে, ফজলুল হক্ তখনকার বাংলার লাটবাহাদুর মিঃ বারোজকে সরাসরি দায়ী করে ও চ্যালেঞ্জ করে বললেন, 'আমাদের বাংলার রাজ্যপাল বাহাদুরকি অপারেশন ঘরের ক্লোরোফর্ম্ম করা রোগী? এখানে দাঙ্গা থামছে না কেন'? হক্ সাহেবের এরূপ কৌতুক পূর্ণ এত অপমানকর কঠোর উক্তিতেও লাটসাহেব একেবারে নীরব। বাংলার অন্যতম প্রভাবশালী বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা হক সাহেবের এইভাবে দাঙ্গা সমর্থন দেখে স্বভাবতই মনে হয়, এ দাঙ্গা অবশ্যই দেশমুক্তির আর এক ধরণের আগষ্ট মুভ্‌মেণ্ট।

তবে, নিজেদের মধ্যে রক্তারক্তি করে দেশবাসীদের কি লাভ? দুর্ব্বল-ভীরু, কাপুরুষ, শুধু বাক্ চাতুরীতে অভ্যস্থ দুই সম্প্রদায়কে একটু তাতিয়ে জাতিকে বুঝি স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সকলে প্রাণের ভয়ে অস্থির হয়ে গোঁড়ামী ভুলে দুই সম্প্রদায় একত্রে মিশে যাবে বলে। এ দাঙ্গা কি তারই পরিকল্পনা? ভারতের ঘরে ঘরে সশস্ত্র সৈনিক তৈরী করা হচ্ছে? জাতিকে অন্যায়ের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াবার জন্যে, সকলকে বারুদ ভরা কামানে পরিণত করবার এই কি দেশ নেতাদের

ভারতীয় ট্রেনিং ? তাই কি কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ্ সাহেব প্লেনে করে ভারতের দিকে দিকে চীৎকার করে বলে বেড়াচ্ছেন 'আমরা আজ আগুণের স্তুপের ওপর বসে আছি, দেশবাসী সব হুঁসিয়ার।' চমৎকার ব্যবস্থা।

আচ্ছা, এ দাঙ্গাটা যদি বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়' আগষ্ট আন্দোলনের মতই হয়, তবে শুধু কলকাতার মধ্যে হল কেন ? কাগজ পড়ে তো ভারি মুস্কিলে পড়লুম। কিছুতেই তো এর সমাধান করতে পারছিনা। কংগ্রেস যখন 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব করে, তখন ভারতের মাত্র দু' একটি দল আগষ্ট মুভ্মেণ্ট শুরু করে। কলকাতার মধ্যে তখন সে রকম কোন মুভ্মেণ্ট চল্তে তো দেখিনি। বরং ১৯৪৩ সালে লোকচক্ষে লীগ মিনিষ্ট্রীর খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবের নিরপেক্ষতায় 'বাংলার দুর্ভিক্ষে' বহু দরিদ্র গৃহস্থ চাষী পরিবার প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণ দিলেন। এর মধ্যে তো মুসলমানের সংখ্যাই ছিল অধিক। এতে লীগের পক্ষে কি লাভ্ হয়েছে ? 'লীগ' কি চেষ্টা করলে এদের অনাহার থেকে বাঁচাতে পারতো না ? এও দেখছি, গভীর চিন্তা করে বুঝে দেখার কথা।

বাংলার বিধান সভার মন্ত্রীদের বিরোধীদল ঐ সময়ে বাংলায়'—পঞ্চাশের মন্বন্তর' (Famine) ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য বহু কলা কৌশলে ও গোপন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিধান সভা বসার দিন রাতারাতি দেশের যত দুঃস্থ, দরিদ্র. ছিন্নবাসধারী ভিখারীদের অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় নিয়ে গিয়ে বিধান সভার আশ-পাশ ভরিয়ে তোলা হয়েছিল। তবুও সবটা কার্য্যকরী করে তুলতে পারা যায়নি। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে দলপতি জনাব ফজলুল হক ও শ্যামাপ্রসাদবাবু বহু দীন-দুঃখীদের ঐ জায়গাতেই বস্ত্রাদি দান করেন ও পল্লীর দিকে দিকে জনসেবার 'অন্নদান ছত্র (ক্যাণ্টিন)' খুলে বহু গৃহস্থ দুঃস্থ পরিবারকে অনাহার থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।

[illegible] লীগের হাতে গড়া দুর্ভিক্ষ দেখে মনে হয় যে. তবে

কি কংগ্রেস প্রস্তাব অনুযায়ী 'আগষ্ট মুভ্‌মেণ্টকে', ভালভাবে পাকিয়ে তোলার জন্যেই মুসলিম লীগ' গোপনে গোপনে বাংলায় দুর্ভিক্ষ তৈরী করেছিল? সত্যিই কি তাঁরা চেয়েছিলেন যে, দেশে দুর্ভিক্ষ তৈরী করে সাধারণের মধ্যে বিদ্রোহের আগুণ জ্বালিয়ে তুলতে? কিন্তু দরিদ্র, নিঃস্ব জনসাধারণ বিদ্রোহী না হয়ে, কপালের দোষ ভেবে, অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করে নিলে, তবু তারা ভারতের শিষ্টাচার ভুলে দেশময় অশান্তির আগুণ জ্বালিয়ে, নিজেদের ন্যায্যদাবী সরকারকে জানাতে পারেনি। এই অপরাধের জন্যেই কি তাদের প্রাণগুলোকে একেবারে উপেক্ষা করা হ'ল। নিরীহ, নির্জীব শান্তিকামী যারা, শুধু যারা দু'টি অন্নের জন্যে লালায়িত, তারা কি রাজনীতির চোখে হয়ে দাঁড়াল দেশের ময়লা না রাস্তার আবর্জ্জনা? তা' না হলে এভাবে অনাহারে, এমন নিষ্ঠুর ভাবে রাস্তায় ফেলে একেবারে মেরে ফেলবার হেতুকি? লোক খ্যাপানো? কলকাতার বাবুরা তাদের দুর্গতি দেখে সকলে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে বলে? তাই কি চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝানো হ'চ্ছিল যে, হে কলকাতাবাসী! তোমরা সকলে মানুষের চোখ দিয়ে ফিরে দেখ, তোমাদের প্রাণ কত মূল্যবান।

নিষ্ঠুর আত্মকেন্দ্রিক কলকাতাবাসী আগষ্ট মুভ্‌মেণ্টের ইঙ্গিত বুঝতে পারেনি বলেই কি '১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' কঠোর আদেশ কলকাতার প্রতি ঘরে ঘরে ছিটিয়ে দিলে? নিরীহ প্রাণগুলি দু'টি অন্না-ভাবে, কলকাতার প্রতি দ্বারে উপেক্ষিত ভাবে আত্মাহুতি দিয়েছে বলে কি, তাই আজ কলকাতাবাসীদের প্রাণবিনিময়ের সাজা। চমৎকার বিচার।

কিন্তু, এ বিচার করছে কে? যাঁরা ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্তা, না বিধাতার জ্বলন্ত অভিশাপ? এইভাবে আবোল-তাবোল কত কি ভাবলুম। কিছুই ঠিক করতে পারলুম না। শেষে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লুম রাস্তায়—বন্ধুদের খোঁজে।

পঞ্চদশ পর্ব্ব

কু-সংস্কার বর্জ্জনে মিঃ জিন্না

সকালের আসর বেশ জম্‌কাল হয়েছে। সকলে চা পানের সঙ্গে গজালী পেটা হচ্ছে। কোথেকে পাঁচুদা ওরফে আলিবাবা প্রবেশ করল। ঢুকেই বললে, 'শুনেছ? লীগের ছেলেরা কাদের ছেলেকে রাস্তা থেকে ধরে গাড়ীতে তুলে, কোথায় নিয়ে গেল। শচীনদা বললে, সেকি? এখানেও এরকম হচ্ছে? এতো দেখছি বেশ কাণ্ড। যেন ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাস। বিভূতি বললে, মানুষের আচ্ছা উৎকট্‌ আনন্দ। নিরীহ প্রাণের ভয়ে ছট্‌ফট্‌ করবে, আর তার দুর্দ্দশা দেখে, অপর প্রাণে আনন্দ উথ্‌লে উঠ্‌বে, এ যেন গ্রাম দেশের নারী হরণ'।

গোপেন বললে, মানুষের আনন্দ পাওয়া, এ দেখছি এক ধরণের মনের বিকার। তাই কারো পুকুরের সখ, আবার কারো সখ হচ্ছে কুকুরের। নন্দদা বললে, আমাদের পাড়ার দিকে এখনও যা' শুনছি, তা'তে তোমাদের বৌদিকে সাত তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ফিরিয়ে না আনলেই হোত। কেশবদা বললে, পরের বাড়ীতে থাকার অসুবিধা কত। সাধে কি আর বিপদ বুঝেও লোক বাড়ী ফিরছে।

গোপেন বললে, বিপদ্‌ বুঝছে, অথচ পরের বাড়ীতে থাকার অসুবিধা মানে?

সত্য হাসতে হাসতে বললে, এ আর বুঝছোনা গোপাল দা। পরের বাড়ীতে থাকার অসুবিধা মানে, 'বেড্‌টি' না খেয়ে ভোরে উঠ্‌তে হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে নিত্যকার ঘরোয়া ঝগড়া করার সুবিধা হবেনা। কারো হয়তো রাত্রে ঘরের ভেতরেই বাইরে

যাওয়া অভ্যাস। কেউ হয়তো গোপনে নেশা করেন। কারো দিবা নিদ্রা না হলে মাথা ধরে, কেউ হয়তো সন্ধ্যে হতেই শু:য় পড়েন, কেউ রাত্রে তিনটা থেকেই শুয়ে শুয়ে চীৎকার করে হরিনাম করেন, কেউ ঘুরে ঘুরে ঠাকুর নমস্কার করেন, কেউ কাজ করার সঙ্গে গজ্ গজ্ করতে থাকেন, কারো আবার প্রকটভাবে শুচিবাই আছে, কেউ কাক ভোরে উঠে গোবরজল ছড়া দেন। এসব অনেক রকম অসুবিধা আছে বৈকি। তা' না হলে যেখান থেকে মানুষ প্রাণের ভয়ে বাড়ী ঘর-দোর সব ফেলে রেখে ঘুম চোখে পালিয়েছে, আর সেখানে সেই মানুষ গোলমাল না থামতেই এত তাড়াতাড়ি সহজ মন নিয়ে ফিরে আসে? তাই মনে হয়, এ হাঙ্গামার ফলে আমাদের ভেবে দেখা ও বুঝে চলার সংযমী চরিত্র গঠনের বেশ দ্রুত সাহায্য করা হচ্ছে। অমিয় মুখ ভেংচে খুব উত্তেজিত হয়ে কলা দেখিয়ে বললে, ছাই হ'চ্ছে। যা' হোক মন গড়া একটা কিছু বলে গেলেই হল। আমাদের সত্যবাবুর কি চিন্তাশক্তি। বাহবা দিতে হচ্ছে করছে ভাই। অমিয়র বলার ভঙ্গি, সকলকে হাসিয়ে দিলে। সত্য তবুও হাসতে হাসতে বললে, বেশতো। রাগ ঝগড়া না করে, যা সব বলি তা' একে একে মিলিয়ে দেখনা—মেলে কিনা।

(এক) এই দাঙ্গা হাঙ্গামা বিস্তারে দেশের মধ্যে চুরি. ডাকাতি বন্ধ ও তার সঙ্গে আবগারি দোকানগুলি বন্ধ হয়ে কড়া পিকেটিংয়ের কাজ করছে।

(দুই) হাঙ্গামার হট্টগোলে অনেকের মধ্যে জাতিভেদ্. অস্পৃশ্যতা, নানা রকমের ছুঁত স্বভাব নষ্ট হচ্ছে।

(তিন) ধনী-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র. শিক্ষিত-অশিক্ষিত দেশী-বিদেশী, জাতি, উপজাতির তফাৎ বোধ দ্রুত পরিবর্ত্তন হচ্ছে।

(চার) সাম্প্রদায়িকতার জেদী মনোভাব, যা' আমাদের মনের মধ্যে পোষা আছে, তা' প্রকাশ পেলে জাতি ও দেশের পক্ষে কতটা অধঃপতন হয় তা' চাক্ষুস দেখিয়ে সকলকে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে।

(পাঁচ) জাতির অসমতা, ভীরুতা নষ্ট হ'চ্ছে ও দেশের খয়ের খাঁরা সকল বিষয়ে অকেজো হয়ে গেছে।

(ছয়) পুলিশের ভয় তুচ্ছ করে, আত্মরক্ষার অস্ত্র-শস্ত্র সকলের ঘরে স্বাধীনভাবে রাখবার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

(সাত) ঘোরতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পুলিশ ও মিলিটায়ীর মধ্যে স্বজাতিত্ববোধ ফিরিয়ে আনা হ'চ্ছে। এর ফলে বৃটিশ পক্ষকে আগের মত তারা সমর্থন করতে পারছে না।

(আট) সকলে শান্তিতে বাস করতে হলে যে, সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় করে মিলে মিশে থাকার প্রয়োজন হয় তা' বুঝে দেখার অবস্থায় দাঁড় করান হয়েছে।

(নয়) সকলের মধ্যে দেশাত্মবোধ, প্রতিবেশীদের প্রতি আত্মবিশ্বাস ও পূর্ণ নাগরিকত্ব রক্ষার জ্ঞান বাড়ান হ'চ্ছে।

(দশ) ঘোরতর দাঙ্গা বাধায় সরকারের চোখের সামনে সকলকে বেপরোয়া সৈনিক ও সমগ্র ভারতকে 'দুর্গে' পরিনত করার সুযোগ দেয়া হয়েছে এবং এতেই ব্রিটিশ রাজশক্তি দিনেরপর দিন একেবারে অকেজো হয়ে যাচ্ছে।

তাই দেখনা, যেখানে মাত্র একটি সম্প্রদায় নির্ব্বিবাদে, বেশ আরামে, বিলাসিতার সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করছেন, সেখানে দুর্গতদের আশ্রয় দেবার সুযোগ নিয়ে ভিন্ন সম্প্রদায়ের রিফিউজিদের দলে দলে নিয়ে গিয়ে পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ ঘটিয়ে সকলকে অস্ত্র ব্যবহারে ভালভাবেই বাধ্য করান হ'চ্ছে।

আবার অন্যদিকে আদর্শের প্রত্যক্ষ নজির স্বরূপ, 'আজাদ হিন্দ ফৌজী দল' হিন্দু মুসলমান মিলনের চমৎকার নিদর্শন খাড়া রাখা হয়েছে। অবস্থার মাধ্যমে যেন নেতারা বলছেন যে, হে ভারতবাসী! তোমরা ভাতৃত্বভাবে দলে আজাদ হিন্দ ফৌজের দল বাড়িয়ে, তালে তালে পা ফেলে

দুই সম্প্রদায়ের মঙ্গলকারী 'ভারত ন্যাশান্যাল কংগ্রেসকে' মেনে চলো। এতেই আমরা স্বাধীনতা পাব।

সন্ন্যাসী হাসতে হাসতে বললে, কিহল-কিহল? সত্য কি এখন লীগভক্ত পুরো পুরি কমিউনিষ্ট হয়ে গেছে?

বিভূতি বললে, না-না, এ কমিউনিষ্টের কথা নয়। সাধারণ ভাবে আমরা জানি যে, জিন্না সাহেব অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান ও বরাবর ভারতে দাঙ্গা বাঁধানই তাঁর কাজ এবং লর্ড লিন্‌লিথগো তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গদানে জিন্নার আগেকার দেশাত্মবোধ একেবারে সমূলে উচ্ছেদ্ করেছেন। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা তো দেখি, জিন্নার সাম্প্রদায়িক ভাবের বদলে তাঁর মধ্যে আছে জাতীয়তা ভাবের প্রভাব ও একনিষ্ঠ দেশ সেবা। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মিষ্টার জিন্নার নিজের চাল চলন ও তাঁর পারিবারিক আচার-ব্যবহারে বেশ প্রমান পাওয়া যায়।

জিন্না স্বয়ং হিন্দুর টিকি রাখা, মুসলমানদের দাড়ি রাখা ও মেয়েদের পর্দ্দানশীনের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাই তাঁর নিজের ও প্রিয় শিষ্য বর্গের কারো দাড়িনেই এবং ভারতপূজ্য দেশনেতৃ ভগিনী মিস্ ফাতেমা জিন্নাকে নিয়ে, বিনা বোরখায় সকল সভা সমিতি ও লাট দরবারে যোগদান নিয়তই করতেন।

সত্য বললে, ঠিকইতো। আমাদের সমাজনীতি, রাজনীতি লোকাচারনীতি নিজেদের প্রয়োজন অনুপাতে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল, মিঃ জিন্না তাই-ই করেছেন।

নিশীথ বললে, জিন্না সম্বন্ধে অনেক কিছু বলবার আছে। এই জিন্না সাহেব মুসলিম লীগে পুরাপুরি থেকেও 'সাইমন কমিশন বয়কটে ইনি ছিলেন বিশেষ ভাবে অগ্রনী। ইনি দেশ সেবায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে উৎসাহের সঙ্গেই সবাইকে বলতেন, 'যদি আমরা সকলে ভাবি যে, মানুষ সমাজের সেবা করাই মানুষের কাজ। এর বিনিময়ে আমাদের কোন কিছুই প্রাপ্য নেই। তবেই সকল দন্দ্বের অবসান সঙ্গে দেশ সেবা সার্থক হবে'।

নন্দদা বললে, লীগ পত্তন সময়ে বড়লাটের কাছে মুসলিম ডেপুটেশনে ১৯২১ সালের কংগ্রেস সভাপতি হাকিম আজমল খাঁন যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু লীগের এই জিন্না সাহেব, তখনকার বাংলা ভাগ ও সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী বর্জ্জনের জন্যে এতে যোগদান করতে গররাজী হয়েছিলেন। ইনি লীগের স্থায়ী প্রেসিডেণ্ট হয়েও ১৯৩৩ সালে জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীর সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে জাতীয়তা বাদী মুসলিম বলে, সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। ইনি মুসলিমদের চলতি সমাজের কতকগুলি কু-সংস্কারের বিরোধীতা করেন। ১৯২০ সালের শেষ পর্য্যন্ত ইনি কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন। জিন্নার কংগ্রেস ছেড়ে যাওয়ার কারণ বাহ্যত সাম্প্রদায়িক হলেও আসলে তিনি দেশোদ্ধার আন্দোলনকে ব্যাপক শক্তিশালী করতে ও জাতির ধর্ম্মান্ধতার বিদ্বেষ নষ্ট করতে এক নব পরিকল্পিত সূক্ষ্ম রাজনীতির মাধ্যমে কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদেন। এর ফলেই ১৯২১ সাল থেকে দেশোদ্ধার আন্দোলন আরো জোরদার হয়।

জিন্না সাহেবের দেশোদ্ধারের সুপরিকল্পিত ও মহত্তর নব নব কর্ম্ম কৌশলে মুগ্ধ হয়ে মহানন্দে রাজনীতি বিশারদ ভারতের শ্রেষ্ঠা বিদুষী সরোজিনী নাইডু উৎফুল্ল চিত্তে মিঃ জিন্নাকে 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের দূত' বলেই বর্ণনা করেন। বোম্বায়ে 'জিন্না হল' এখনও সেই খ্যাতির জীবন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে।

মুসলিম লীগে থেকেও জিন্না সাহেব কংগ্রেসকে মাত্র হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান একথা বলেন নি। এই মর্ম্মে ১৯২৫ সালে 'টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়াতে' ইনি পত্র লেখেন।

১৯২৪ সালে দেশবন্ধু রচিত যুক্ত নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলিম চুক্তির জন্যে মিঃ জিন্না প্রস্তুত ছিলেন। ইনি ১৯১৯ সালের কু-খ্যাত রাউল্যাট আইনের প্রতিবাদে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য পদ ঘৃণার সঙ্গে বর্জ্জন করেন।

হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রতিষ্ঠান যে কংগ্রেস, একথা সকলকে

জানাতে জিন্না বার বার চীৎকার করে বলতেন, 'মৌলানা অবুল কালাম আজাদ কংগ্রেসের শো-বয়'। অর্থাৎ ভারতের হিন্দু-মুসলমান তথা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যেন জিন্না বলছেন, 'আরব দেশের মক্কার সুসন্তান, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মত সত্যাশ্রয়ী একনিষ্ঠ সাধক ও ধর্ম্মপ্রান, পবিত্র মুসলমান ধর্ম্মের বিখ্যাত পণ্ডিত মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব, যিনি মুসলমান সমাজের ও ভারতের গৌরব রত্ন, তিনিই আজ ভারত কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট। ভারত কংগ্রেস যে, মাত্র হিন্দু প্রতিষ্ঠান নয় তা' মনোযোগ দিয়ে ভাল ভাবে বুঝে দেখার চেষ্টা কর।

আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর হীণমন্য হিন্দু-মুসলিম কিছু নেতা, নামজাদা দেশ হিতৈষী অগ্রদূত আছেন, যাঁরা ভেতরে ভেতরে আজও হিন্দু-মুসলিম স্বাতন্ত্রের মারাত্বক প্রচারক, তার কারণ না বুঝে, জিন্না সাহেবকে গালাগালি দেওয়া যে, শালীনতা বিরুদ্ধ শুধু তাই নয়, দেশের সাম্প্রতিক ঘটনার ইতিহাস সম্পর্কে তা'হলে জেনে শুনে সকলের ইচ্ছে করেই চোখ বুজে থাকা হয়।

ষোড়শ পর্ব্ব

গান্ধীজীর নোয়াখালি পরিদর্শন

রাত জেগে পাহারা দিতে দিতে শেষ বাসরের ঝিমুনীতে একটু শুয়ে নিদ্রাদেবীর করুণা লাভ করছি। আর ছেলেরা কানের কাছে সমানে গজ্ গজ্ করে চলেছে।

মনি বলছে, 'আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার গুণে ছেলেরা হয়েছে বেকার। আর সমাজ ব্যবস্তার গুণে মেয়েদের বর জুট্ছে না। ঋষিদের অন্তর শুদ্ধি, যাগযজ্ঞ, সমাজসেবা, এখন মাত্র 'নামগান' ও ভূরিভোজনে দাঁড়িয়েছে। মানুষ আবার বন্য ও নৃশংস হয়ে উঠছে। দেশের এসব অশুভ তরঙ্গ রোধ করতে সৎমানুষের সঙ্গে দরকার কড়া আইন ও উপযুক্ত শাসনের। নইলে অচিরেই মানুষ আগের মত ঠগ্ ও লড়ায়ে জন্তুতে পরিণত হবে।

বোনা বলছে, কল্যানকর রাষ্ট্র গড়তে রাজনীতির কাঠামোকে আরো উন্নতিশীল ও শক্তিশালী করতে হবে। এর জন্যে আনতে হবে সমাজনীতির আমূল পরিবর্ত্তন। গড়তে হবে সমাজনীতিও নতুনতর সংবিধান। আনতে হবে সবার মধ্যেই সাম্প্রদায়িক ঐক্য। এই ঐক্যই হয় পরস্পরের আত্মীয়তার বন্ধন ও ঐক্যই শক্তিশালী জাতি গঠনের মূলমন্ত্র।

কে বলে উঠল, ঠিক বলেছিস্। মানুষ বেঁচে থাকলেই তার কতকগুলি মৌলিক সমস্যা থাকে, এর মধ্যে ক্ষুধা ও অজ্ঞানতাই প্রধান। এই ক্ষুধা ও অজ্ঞানতা থেকেই যত সব অশুভ বুদ্ধির উদ্ভব হয়। এ সকল সমাধানের গুরুদায়িত্ব সরকারকে শক্ত হাতে নিতে হবে।

বেজু বললে, শহর ও পল্লী সংস্কারের জন্যে রাস্তা, ড্রেন, জল, আলো, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষাকেন্দ্র, হাট, বাজার প্রভৃতি প্রস্তুতির কাজে সরকারকে মনোযোগ দিতে হবে এবং ঐসকল সংস্কারেব কাজে স্থানীয় দুঃস্থ লোকদের কাজে লাগালে কিছুটা বেকার পোষণের সঙ্গে দেশের কাজও দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে পারবে।

নিতাই বলছে, আমাদের কথক ঠাকুরদের মুখ দিয়ে পল্লী উন্নোয়নের মত লোক শিক্ষা প্রচার করলে ভাল হয়। এবং মহাত্মাজীর দৈনিক রাজনৈতিক প্রার্থনা সভার মত প্রতি পল্লীতে স্থায়ীভাবে জন-শিক্ষার প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করতে পারলে মন্দ হয়না।

মনি বললে, কার্য্যক্ষম পেনসনভোগীদের স্থানীয় পল্লীসেবা কাজে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করলে পল্লী গঠনের কাজ ভাল হবে।

চারিদিক থেকে হুইশীল বেজে উঠল। সব পাহারা ঘাঁটি থেকেই চীৎকার 'দাঙ্গা নয়, দাঙ্গা নয়, 'মিলিটারী, মিলিটারী'। সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম মিলিটাবী-সেনা বোঝাই গাড়ী পাশ দিয়ে চলে গেল। তখনও কারফিউ রয়েছে। পুব দিক থেকে সবেমাত্র কাকডিমে আলো জাগছে।

ভোর রাত্রি হ'তে পরস্পর প্রহরা ঘাঁটির ছেলেরা খবর ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। জিন্না সাহেব নাকি মুসলিম ন্যাশন্যাল গার্ড পাঠান দল নিয়ে আজ কলকাতায় আসছেন। কলা বাগান বস্তি, কলুটোলা, পার্কসার্কাস, রাজাবাজার, বাগমারী ও সেই সঙ্গে আরো মুসলিম প্রধান জায়গাগুলিতে তাই নতুন করে সাজো-সাজোরব। বংলার জুটমিলের ও খিদিরপুর ডকের মুসলিম শ্রমিকেরা আজ একসঙ্গে ব্যাপক সংগ্রাম আরম্ভ করবে। এবারে এখানকার দাঙ্গাতেও পাঞ্জাবের মত ষ্টেন্‌গান, ডিনামাইট্‌ এসবই নাকি ব্যবহার কবা হবে। এর ফলে হয়তো পাঞ্জাবের মত বাংলাতেও মৃতদেহ স্তূপীকৃত হবে ও রক্তের স্রোত বইবে।

খবর শুনে সকলে ভয়ে জড়ো সড়ো হয়ে গেলুম। গ্রামের বড় বড়

মাতব্বর ও দুঃসাহসী শক্তিমান গোঁড়া হিন্দুদের ভয়েতে গলা বসে গিয়ে, ফিস্ ফিস্ করে কথা শুরু হ'ল। বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা কর্ত্তাদের অবস্থা দেখে, ভূতের ভয়ের মত সকলে নিস্তব্ধে চোখ বড় বড় ক'রে, ভয় ভাবনার সঙ্গে এক একদিকে দল পাকিয়ে বসে থাকল। পথে লোকজন প্রায় চলে না।

গ্রাম ও শহরের ছোট বড় নেতারা কাগজের অফিসে ফোনের পর ফোন করতে লাগলেন। সঠিক খবর পাবার তাগিদ্ সকলেরই বেড়ে উঠল। বেলা হবে তখন একটা। অনেক চেষ্টা করে, সংবাদসেবীদের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল যে, কায়েদে আজম জিন্না সাহেব নাকি নোয়াখালি পরিদর্শন করতে আসছেন না। সে জায়গায় বাংলায় আসছেন মহাত্মাজী নোয়াখালির দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করতে।

এই সু-খবরটি পেতেই, বসন্ত-মলয়ের মত সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছড়ি-য়ে দেওয়া হল। সকলে যেন দম্ছেড়ে বাঁচল। মনের আকাশে গাঢ় মেঘ কেটে গিয়ে যেন সূর্য্যদেব উঠলেন। সাহসে ভর করে আবার সকলে পূর্ব্ব কর্ম্মশক্তি ফিরে পেলেন। মহাত্মাজী শান্তির অভয়বাণী নিয়ে সত্যি-সত্যিই কলকাতায় এলেন।

মহাত্মাজী সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করতে লাগলেন। তৎ-কালীন বাংলার প্রধান মন্ত্রী হিন্দু বিদ্বেষী সহিদ সুরাবর্দ্দি সাহেব তখন ঘন ঘন সোদপুরে আসতে লাগলেন। দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা আক্রাম খাঁ যেন কপট রাগের সঙ্গে মিঃ সুরাবর্দ্দিকে কড়া কৈফি-য়ৎ তলব করে বললেন, মিঃ গান্ধী একজন হিন্দু। তার কাছে ঘন ঘন এত বেশী যাতায়াত কেন? লীগমন্ত্রী বারে বারে গান্ধী দর্শনে যাওয়ায় মুসলীম লীগের এতে অপমান হচ্ছে।

জনাব সুরাবর্দ্দি খাঁসাহেবের কথায় কর্ণপাত না করে তাঁর বাড়ীর ছেলে মেয়েদের নিয়ে নিত্য রাজগুরু দর্শনের মত মহাত্মা সাক্ষাতে আস-তে লাগলেন।

এদিকে বাংলার গভর্নর মিঃ বারোজ ও বড়লাট বাহাদুর লর্ড ওয়াভেল দু'জনে নোয়াখালি পরিদর্শন করে এসে ষ্টেটমেণ্ট দিলেন 'নোয়াখালির বর্ত্তমান অবস্থা শান্ত। ভ্রমন পথে এক জায়গায় প্রচুর ধোঁয়া উঠতে দেখায় সেখানে অবতরণ করে প্রত্যক্ষ করেছেন যে, গ্রামবাসীরা কাঠ জ্বেলে রান্না করছে।'

এ হয়তো ভারত নেতাদের পূর্ব্ব হতেই গড়াপেটা ছিল। কেননা, এরপরই মহাত্মাজী গেলেন নোয়াখালির দুর্গতদের ব্যবস্থা করতে। গান্ধীজীর সঙ্গে গেলেন কয়েকজন লীগপতি জনাব শামসুদ্দিন প্রভৃতি। এঁরা সকলে যেন মহাত্মাজীর বডিগার্ড রূপে সঙ্গে ছিলেন। গান্ধীজী নোয়াখালি থেকেই ষ্টেটমেণ্ট দিলেন, 'আমার উপস্থিতির পরেও দু'একটি জায়গায় দুর্ঘটনা ঘট্ছে এবং বহু অমানুষিক নির্ম্মম ঘটনা এখানে ঘটে গেছে'।

গান্ধীজীর ষ্টেট্মেণ্টের সঙ্গে ভাইসরয়ের ষ্টেট্মেণ্ট এই খানেই মিল খায়নি। এতে মনে হয়, গান্ধীজীর নোয়াখালি যাত্রার বাধাদানের জন্যেই হয়তো বড়লাট বাহাদুর প্রকৃত অবস্থাটা চেপে গেছেন, নয়তো লীগের সাঙ্গ-পাঙ্গ মাতব্বরেরা লাটসাহেবদের এমন আঁদাড়-পাঁদাড় জায়গা দিয়ে ভ্রমণ ও দৌড় করিয়েছেন যে, তা'তে আসল বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি লাটসাহেবদের দৃষ্টি পথেই আসেনি। এ আমাদের মন্দ রাজনীতি নয়।

মহাত্মাজী নিজের দলবল ছেড়ে নৌকা যোগে নদী পার হয়ে, সুদূর পল্লীর গণ্ডগ্রামে অত্যন্ত বিপদ্জনক এলাকায় ধান ক্ষেতের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে শীতের কুয়াশার ঠাণ্ডা ভেদ্ করে ঐতিহাসিক যাত্রা আরম্ভ করলেন। সারা পৃথিবী শঙ্কিত হয়ে ভাবতে লাগল যে, সত্যিই বুঝি ভারতের কি বিপদ্ হয়। কিন্তু মহাত্মাজী অক্ষত শরীরে নোয়াখালিতে অবস্থান করতে লাগলেন। আর সেখানে সীমান্তের হাজার হাজার দুরন্ত পাঠান শত্রুদের এড়িয়ে, ওয়াজিরিস্তান পরিব্রাজক, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুজী নোয়াখালিতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে জনসভা হতে তাঁর মাথায়

পুরস্কার পান নোয়াখালির ইট্। এখানে প্রশ্ন জাগে যে, গান্ধীজীকি ভেল্কি বাজীর চাঁড়ালের হাড় না ইলেকট্রিকের পাওয়ার হাউস্, কি জন্যে নোয়াখালির দুর্ব্বৃত্তরা মহাত্মার মত নিরস্ত্র মানুষকে কোন আঘাত করতে পারে না ?

কংগ্রেস ও লীগে মিতালী না থাকলে কি কখনও এত বড় অন্যায় অত্যাচার যা'ভারত-ইতিহাসে কখনও ঘটেনি, সে সকল দুর্ঘটনা অবাধে ঘটে গেল, আর তার প্রতিবাদে কোন দেশনেতা, কোন বিপ্লবী, কোন সাংবাদিক, কোন ধর্ম্মগুরু, কোন কথক পণ্ডিত, দেশের কোন অভিভাবক এমনকি জাতির পিতা মহাত্মাজী পর্য্যন্ত লীগের কোন নেতাকে সরাসরি দোষী সাব্যস্ত করলেন না।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। ১৯৪০ সালে ৮ই ডিসেম্বর জাপান সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এই সুযোগে একজন জাপানী বাঙ্গালী ভদ্রলোক জাপান সরকারের সাহায্যে ভারত হ'তে বৃটিশ শক্তিকে উৎখাত করবার জন্যে কবচ কুণ্ডল ধারী কর্ণরথীর মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। ইনি তখন তৎপর টোকিওর ভারতীয়দের নিয়ে এক জরুরী বৈঠক আহ্বান করেন। এই বৈঠকের মূল আলোচনায় ভারতকে স্বাধীন জাতি হিসাবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এঁদের বৈঠকের তোড়জোড় ও কর্ম্মপদ্ধতির কায়দা দেখে, জাপানের সামরিক মন্ত্রীসভা সাদরে ও সানন্দে এঁদের এই কর্ম্মপন্থা স্বীকার করে নেন্ এবং এই সংস্থা 'ভারতীয় স্বাধীন লীগ' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরে জাপান সরকারের স্বীকৃতি পায় এবং টোকিওতেই প্রথমে স্বাধীনতা লীগের প্রধান দপ্তর স্থাপিত হয়।

এদিকে নেইআঁকড়ে যোদ্ধা জাপান বিভিন্ন দেশ জয় করতে থাকলে, জাপানী অধিকৃত দেশে ভারতীয়কে শত্রু মনে করে কোন ভারতীয়ের ওপর পাছে কোন অত্যাচার হয়, এই আশঙ্কায় জাপানী বাঙ্গালী ভারতের ভদ্রলোকটি অবিলম্বে জাপানের সামরিক মন্ত্রীসভার ওপর

ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করে, ভারতীয়দের যে, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন শুধু তাই নয়, এঁরই অতি চেষ্টার ফলে প্রধানমন্ত্রী তোজো সরকারী ঘোষণা করলেন, 'ভারতীয়েরা জাপানের বন্ধু'।

এখানে মনে করে রাখার কথা যে, এই জাপানী বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি হচ্ছেন, আমাদের চির আত্মীয় ও চির পরিচিত বিপ্লবী মহানেতা রাসবিহারী বোস।

এই রাসবিহারী বোস অনেক বছর ধরে ভারতের জন্যে জাপানে ও পূর্ব্ব এশিয়ায় অক্লান্ত পরিশ্রম করছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছিল। এজন্য তাঁর মত কার্য্যক্ষম ও যোগ্যতর যোদ্ধা ব্যক্তির হাতে তাঁর স্থাপিত ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' এবং আই. এন, এ'. বা 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' এর ভার অর্পণের সঙ্কল্প করেন। জাপানের সামরিক দপ্তরেরও এতে সর্ব্বসম্মতি ছিল।

তাই ১৯৪৩ এর ২রা জুলাই সিঙ্গাপুরের একটি প্রেক্ষাগৃহে প্রকাশ্য সভায় বিপ্লবী রাসবিহারী বোস আনুষ্ঠানিক ভাবে ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ ও আই. এন, এর' দুইটীর সর্ব্বোচ্চ নেতৃত্ব (সুপ্রীম কম্যাণ্ড) সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে অর্পণ করেন এবং নিজে থাকেন এসবের প্রধান পরামর্শ দাতা হিসাবে। এই শুভক্ষণে পূর্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ দুই মহান্ ও সিংহ বিক্রমী ভারতীয় যোদ্ধার চোখ তখন আনন্দ আবেগে অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। সেদিন জাপানে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোধা এবং জাপানে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ ও দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ এর স্রষ্টা বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বোসের তিরোধান ঘটে, ১৯৪৫ —এর ২১শে জানুয়ারী। সে সময় রাসবিহারীর বয়স হয়েছিল মাত্র ষাট্ বছর। রাসবিহারী স্বল্প-স্থায়ী জীবনের দীর্ঘ ত্রিশ বছর কেটেছে জাপানে। রাসবিহারীর মৃত্যুর চারদিন পরে ১৯৪৫ এর ২৫শে জানুয়ারী অতি শোকাচ্ছন্ন [illegible]

সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে আজাদ হিন্দ্ সরকারের মন্ত্রীমণ্ডলী ও উপদেষ্টাদের নিয়ে যে বৈঠক বসে, সে বৈঠকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে রাসবিহারীর অমর আত্মার প্রতি শোক জ্ঞাপন করা হয় এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যে বিরামহীন স্বাধীনতা সংগ্রাম পূর্ণোদ্যমে চালাবার মৃত্যুপণ শপথ গ্রহণ করা হয়।

এরপর সংগ্রামের অগ্রগতি নতুন মোড় নেয়। নেতাজী সুভাষ আজাদহিন্দ ফৌজকে নতুন করে ঢেলে সাজালেন। এক একটি ব্রিগেডের নাম দিলেন, 'ঝাঁসীরাণী ব্রিগেড, গান্ধী ব্রিগেড্, 'আজাদ্ ব্রিগেড্, মেহেরু ব্রিগেড্ প্রভৃতি। ভারতে যখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ক্ষমতা লাভের বিষদৃশ দ্বন্দ্ব চল্‌ছে, সুভাষ তখন জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ নির্ব্বিশেষে সমান মর্য্যাদায় সামরিক জাতীয় বাহিনী গড়ে তুলছেন। নেতাজী তাঁর ফৌজীদের ধ্বনি দিলেন 'জয়হিন্দ্'। চলো চলো, দিল্লী চলো।

গোপেন বললে, 'কি হে, তোমরা যে রাজনীতির ঝড় বইয়ে দিচ্ছো। তা'হলে লড়াই ও দাঙ্গা এসব আমাদের নেতাদের তৈরী?'

প্রফুল্ল বললে, আবার দেখুন না। দাঙ্গা থেকে হিন্দুদের নিরাপদ করবার জন্যে 'হিন্দু মহাসভার ঝাণ্ডা' উড়িয়ে শ্যামাপ্রসাদ বাবু বঙ্গবিভাগ করতে যাচ্ছেন। দেশে দেশে এ ধরনের পার্টিশান আনলে জনসাধারণ একদিন বুঝবেন যে, হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের পরিণতি কোথায় দাঁড়ায়।

শচীনদা বললে, পার্টিশান মানবে মানে?

প্রফুল্ল বললে, মানে আর কি? ৫ই ডিসেম্বর বৃটিশ ভাষ্য যা' মুসলিম লীগের স্বপক্ষে ছিল, তা' যেমন করে কংগ্রেস ধীরে ধীরে মেনে নিয়েছে, তেমনি দাঙ্গা থেকে হিন্দুদের ও মুসলিমদের/সবাইকে রক্ষা করতে কংগ্রেসই হয়তো সবার আগেই চাইবে পাঞ্জাব ভাগ ও বাংলা ভাগের পার্টিশান, এতেই হয়তো ছোট ছোট রাষ্ট্র তৈরী হয়ে আইন শৃঙ্খলার সাহায্যে দেশ রক্ষার হুঁশিয়ারী বাড়বে ও জাতির অগ্রগতি ত্বরান্বিত হতেও

—— এই দেশ বিভাগই মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনের এমন

অসুবিধা আনবে, যা'তে সকলেই একদিন হাড়ে হাড়ে বুঝবেন যে, একে অন্যের বিরোধিতা করে, দেশে দেশে বেড়াজাল টেনে, কোন সম্প্রদায় সুখে বাস করতে পারেনা। কেননা, এক একটি প্রদেশ এক এক প্রকার কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধ এবং ওই সব প্রদেশে বা রাষ্ট্রে যদি পূর্ণ সহযোগ না থাকে, তা'হলে সকল প্রদেশে ও রাষ্ট্রে এক এক জিনিষের ছুর্ভিক্ষ দেখা দেবে ও পরস্পরে সর্ব্বদা পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। এখন অবশ্য গোঁয়ার্ত্তুমীর দ্বন্দ্ব বাঁচাতে পার্টিশান একান্ত ভাবে অপরিহার্য্য হয়ে উঠলেও ভবিষ্যতে এ ধরণের পার্টিশান দেশের মধ্যে থাকতে পারেনা।

কোন স্বাধীন রাষ্ট্রে এধরণের ভাগাভাগি নেই। কারণ সকল রাষ্ট্রেই তু'টি তিনটি সম্প্রদায় একত্রে মিলে মিশে বাস করেন এবং তাঁরা এদেশের লোকের মত বিপথগামী অবুঝ নন্। 'ইজম্'তো তাই বলে।

নন্দদা বললে, 'ইজম্'তো হোল বাইরের জিনিষ। আসল জিনিষ হোল 'মনুষ্যত্ব'। আমরা ইজম্ রূপী খোসাটাকেই নকল করছি। কিন্তু 'মনুষ্যত্ব' সাধনার ধৈর্য্য নেই।

সত্য বললে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, 'আমরা মানুষে মানুষে পাশাপাশি বাস করি, তবু কিছুতেই মনের মিল হয় না। কাজের কোন যোগ থাকেনা। প্রতিপদে হাতাহাতি, কাটাকাটি, মারা-মারি বেঁধে যায়। এটা একান্তই অমানুষের লক্ষণ। আমরা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে চীৎকার করছি, নিজেদের ধার্ম্মিক মানুষ বলে দাবীও করছি কিন্তু আমাদের মনকে সহজ ধর্ম্ম পথে নিয়ে যেতে পারছি না। তাই ধর্ম্মের নামে হুজুগ তুলে যা' হোক একটা কিছু করে বসছি। এ গুলি তো কোন ধার্ম্মিক মানুষের কাম্য হওয়া উচিত নয়।'

নিশীথ বললে, সত্যিই তো সম্প্রদায়গত ভাবে যে সব সমাজ ব্যবস্থা দেশে দেশে চলে আসছে, তা'তো আকাশ থেকে পড়েনি। এসব মানুষেরই তৈরী। তাই মানুষ তাদের প্রয়োজন মতে এসবের বদল করবে, এইতো নিয়ম। কিন্তু তা' [illegible]

নিশীথ, আমরা সবই বুঝি। কিন্তু কাজের সময় কিছুই বুঝিনা। তাইতো ভাবছি—এখন এর রেমেডি কি ?

আমি বললুম, এ যে তোমার কঠিন প্রশ্ন নন্দদা। সত্য সঙ্গে সঙ্গে বললে, না বীরেন দা। এরও উত্তর আছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় বিদ্রোহ কবি নজরুল ইস্‌লামের ভাষায় তা'হলে বলতে হয় যে, ভারতের টিকি ও দাড়ির বোঝা সকলে স্বেচ্ছায় জাহাজে বোঝাই করে যেদিন সমুদ্র গর্ভে—বিসর্জ্জন দেবেন, সেই দিন থেকে ভারত এ মারাত্মক সাম্প্রদায়িক ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবে।

নন্দদা হাসতে হাসতে বললে, আমি একবার শুনেছিলুম দাড়ি রাখার ওপর এক সময় ট্যাক্স বসানো হয়েছিল। তবে সেটা নাকি হয়েছিল লণ্ডনে। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সময় যাঁরা দাড়ি রাখতেন, তাঁদের পনের দিন অন্তর ৩ শিঃ ৪ পেন্স করে ট্যাক্স দিতে হ'ত। পিটার দি গ্রেটের রাশিয়াতেও দাড়ির ওপর নাকি ট্যাক্স বসানো হয়েছিল। নন্দদার কথা শুনে সকলে হাসতে হাসতে উঠে পড়লুম।

সপ্তদশ পর্ব্ব

নৌ ধর্ম্মঘট ও ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট গঠন

১৯৪৬—২১শে ফেব্রুয়ারী নৌ-ধর্ম্মঘট হল। ধর্ম্মঘট ক্রমশঃ ব্যাপক আকার ধারণ করে ও হাঙ্গামা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গোলন্দাজদের মধ্যে গোলা মিনিময় হয়ে যায়। কুড়িখানা জাহাজের মাস্তুল শীর্ষে একদিকে কংগ্রেস ও অপর দিকে মুসলিম লীগের পতাকা সগৌরবে উড়তে থাকে। দেওয়ালে দেওয়ালে লিখে দেয়া হয় ব্রিটিশ ভারত ছাড়'। ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে দেশী সৈন্যদের লড়াই শুরু হয়ে গেল। ভারতীয় নৌ-বাহিনীর সরাসরি বিদ্রোহ ক্রমশঃ কলকাতা, করাচি, বোম্বে, মাদ্রাজে নৌ-সেনাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এসময় বোম্বাই শহরে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টির পতাকা এক করে রাজ পথে মিছিল বার হয়। এদের সমর্থন জানাতে দেশের নানাস্থানে ধর্ম্মঘট শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকার দেশের এ অবস্থা দেখে (১৯৪৬) ফেব্রুয়ারী মাসেই আজাদ্ হিন্দ ফৌজীদের বিনা সর্ত্তে মুক্তি দেন। তথাপি চারিদিকে বিদ্রোহের দাবানল ধক্‌ধক্ করে জ্বলে উঠল। জেনারেল কারিয়াপ্পা থেকে লেফট্ন্যাণ্ট জেনারেল আকবর খাঁ পর্য্যন্ত এ দ্বন্দ্ব মেটাতে পারছেন না দেখে, ভারতীয় সামরিক কর্ত্তাদের ওপর ব্রিটিশ সরকারের অবিশ্বাস জমে উঠল। সরকার পক্ষের বড় বড় ব্রিটিশ অফিসার, গোরা মিলিটারী ও স্বয়ং ফিল্ড মার্শ্যাল লর্ড ওয়াভেল গিয়েও এ দ্বন্দ্বের দাবানল নির্ব্বান করতে পারলেন না। আর সেই প্রচণ্ড ধ্বংসোন্মুখী দাবানল শেষে লৌহমানব সর্দ্দার বল্লভ্ ভাই প্যাটেল ও আগুণের ফুল্কি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু দু'জনে সহোদর ভীমার্জ্জুনের মত গিয়ে এ দ্বন্দ্বের আপোষ

নিস্পত্তি করলেন। এরকম অহিংসভাবে শান্তি ফিরিয়ে আনায় এঁদের কি কম কৃতিত্ব প্রকাশ পেল? অমিয় বললে, তবু লীগ নেতারা কংগ্রেসের নামে নানা অপপ্রচার করে যাচ্ছেন। প্রফুল্ল হাসতে হাসতে বললে, দেশের নানা মতের লোকদের পরিচালনা করতে নেতাদের অনেক কথাই বলতে হয়, তাই আমাদের বড় গৃহস্থ বাটীর সংসার কর্ত্তাদের মত অনেক কথাই তাঁরা শোনান্। কিন্তু আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার সঙ্গে তার অর্থটি বুঝে নিতে হবে। গান্ধী ও জিন্নার মধ্যে অটুট বিশ্বাস না থাকলে, মহাত্মাজী মনখোলা আনন্দের সঙ্গে কেন বললেন, 'আমাদের অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার পরে কায়েদে আজম জিন্না সাহেব যদি ভারত গণ-পরিষদের কর্ত্তা (প্রেসিডেণ্ট) হন। তা'হলে আমার চেয়ে খুসী আর কেউ হবেনা।'

মহাত্মার এসব কথায় কর্ণপাত না করে যে যার ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব মনোভাব নিয়েই আমরা বলছি, বাংলায় লীগ মিনিষ্ট্রীর দরুণ দাঙ্গা থামছে না। অন্ততঃ কোয়ালিশান মিনিষ্ট্রী হলে কিন্তু এভাবে দাঙ্গা সম্ভব হত না। তাই প্রশ্ন জাগে যে যেখানে কংগ্রেস মিনিষ্ট্রী সেখানে এ ধরণের দাঙ্গা হচ্ছে কেন? এ দাঙ্গাকারী কারা? মাত্র লীগ না ভারতের মুক্তিকামী দল? নন্দদা বললে, দাঙ্গার বেশী করে সূত্রপাত তো ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট গঠন করা নিয়ে।

শচীনদা বললে, হ্যাঁ তাই। (১৯৪৬) ২৩শে মার্চ্চ লর্ড পেথিক-লরেন্স তাঁর ক্যাবিনেট্ মিশন নিয়ে ভারতে এলেন। ভারত নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পরে অন্তর্বর্ত্তী সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মধ্যে লীগই তো প্রথমে মেনে নেয় স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা। তবে পাকে চক্রে লীগ ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট গঠনের ভার কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি নেহেরুর হাতে ছেড়ে দিলে কেন? নিশীথ বললে, ওইখানেই তো লাগে সন্দেহ। বোধহয় কংগ্রেস যেই ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট গঠন করতে বসবে, সেই লীগ ডাইরেক্ট্ এক্সান দিবস পালন করে 'দাঙ্গা' জোরদার করার বেশ

অছিলা পাবে। এবং ভারতের মধ্যে চলবে জোরাল আন্দোলন। তখন এই নিয়ে নাজেহাল হতে হবে ব্রিটিশ সরকারকে।

সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও অন্যান্যদল বহুবার আন্দোলন করেছে কিন্তু খুব বেশীদিন টিকিয়ে রাখতে পারেনি। তাই এটি এবার কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মিঃ জিন্নার কড়া চ্যালেঞ্জ। হয়তো দেশের স্বাধীনতা অর্জন না হওয়া পর্য্যন্ত এ আন্দোলন বন্ধ হবে না। নন্দদা বললে তবে একথা ঠিক যে, ১৯৪৬-এর ২রা সেপ্টেম্বর পণ্ডিত নেহেরু লীগের তিনটি পদ শূন্য রেখে সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদ. রাজা গোপাল আচারী, শরৎ বোস, সাফায়াৎ হোসেন, বলদেও সিং, আসাফ্ আলি, জগজীবনরাম, এন, সি ভাবা, জহির আলি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ নিয়ে ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট গঠন করেন এবং কার্য্যগ্রহণের পূর্ব্বে সকলে সানুনয়ে বাপুজীর আশীর্ব্বাদ গ্রহন করে, ভারতের অর্ন্তবর্ত্তী শাসন ক্ষমতায় যেই আসীন হ'লেন সেই লীগ নেতা জিন্না বেতাবে বক্তৃতা দিলেন. 'ভারত-মুসলিমদেব ভাগ্যা কাশে কাল মেঘ দেখা দিয়েছে। যদি বাঁচতে চাও তো আন্দোলন চালাও'। এর পরেই চারিদিকে দাঙ্গা ও রক্তারক্তি আরো বেড়ে উঠল। ক্রমে দেশময় ব্যাপক হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ল।

এই নিদারুণ দাঙ্গাতেও দেশের চিন্তাশীল মনিষী স্যার সুব্রহ্মন্ম আয়ার পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জুরু, স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষান, সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দেওয়ান চমনলাল, স্যার যদুনাথ সরকার, সাংবাদিক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, আচার্য্য কৃপালনী, ওয়াই, বি, চ্যবন, মুরারজী দেশাই, বিজয়-লক্ষ্মী পণ্ডিত, রাজকুমারী অমৃত কাউর, অরুণা আসফ আলি, জনাব মুজাফফর আহম্মদ, বিনোবাভাবে, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল ঘোষ, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, গোবিদ বল্লভ পন্থ, নৌশের আলি. ইউসুফ মেহেরালি, অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেন, কামরাজ, রফি আমেদ

কিদোয়াই, জাকির হোসেন প্রভৃতি দেশের ছোট ও বড় নেতা, দেশের অন্যান্য অভিভাবক, গণপরিষদের কে, এম, মুন্সি সৈয়দ মহম্মদ শাহ্‌ল্লা, এন, এম, রাউ, বি, এন, মিত্র, গোপাল স্বামী আয়েঙ্গার এবং গণপরিষদ কমিটীর সভাপতি ডঃ আম্বেদকর এঁরা সকলে একেবারে চুপ। বিপ্লবের রণগুরু জয়প্রকাশ, অরবিন্দ, বিপিন, বারীন, এমনকি অজয় মুখার্জী, সতীশ সামন্ত পর্যন্ত সকলে নীরব।

এঁরা সকলে এখন যেন দর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন। এঁরা দেখছেন, লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দেশ ও জাতিকে পাঁচ মাসের মধ্যে পঞ্চাশ বছরের অগ্রগতির পথে এগিয়ে দিয়েছে এবং এখনও লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পুরো ভাবেই অব্যাহত।

দেশের এই মহা সঙ্কট অবস্থায় ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল লীগকে পরিষদে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানালেন। উত্তরে লীগনেতা জিন্না ভাইস রয়ের প্রস্তাবে অনাস্থা জানিয়ে মুসলিমদের জন্য পাঁচটি সিটের দাবী জানান এবং পরিষদে যোগদান করেন না।

মাননীয় ভাইসরয়ের এ অনুরোধ মিঃ জিন্না উপেক্ষা করায় বৃটিশ আভিজাত্যে কেমন যেন আঘাত লাগল। ভাইস রয় মনে মনে খুব ক্ষুণ্ণ হলেন। এইনিয়ে লীগনেতা মিঃ জিন্নার সঙ্গে সরকারের বিরোধ প্রায় বাধে বাধে। বড়লাট এবার আর একটু কড়াভাবে মিঃ জিন্নাকে পরিষদে যোগদানের কথা জানালেন। বড়লাটের এ হুমকি তুচ্ছ করে অনমনীয় লীগনেতা শস্ত্রবিদ্‌ দ্রোণাচার্য্যের মত সংগ্রাম কৌশলী জিন্না জোরালো ঘোষণা করলেন, 'আমাকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হোক।'

মিঃ জিন্নার একথা শুনে দেশের সকল হিন্দু ও মুসলমান বিস্ময় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। এবার বুঝি মিঃ জিন্নার রাজনীতি অভিনয়ের মুখসটি খুলে পড়ে। এই বুঝি সরকারের সঙ্গে ডাইরেক্ট, এ্যাকশন আরম্ভ হয়। তাঁদের মুখ ঘোরে ঘোরে। "দেশ ও জাতির এরূপ সংকটোন্মুখ চরম অব-
[illegible] সাহেবের সঙ্গে ঐগিরি এটোপ, ভূপালের খ্যাতনামা

নবাব এয়ার মার্শ্যাল হিস্ হাইনেস্ স্যার হামিদুল্লা খাঁন সিকান্দার সাউলাৎ ইফ্‌তিকার উলমুলক বাহাদুর সাহেব। এঁর মধ্যস্থতায় দ্বন্দ্ব থামল। বৃটিশ পার্লামেন্টের মত পালটাল। বড়লাট বাহাদুর লীগকে পাঁচটি সিট-ই দিলেন। মিঃ জিন্নার এবার অসন্তোষ নষ্ট হল। কংগ্রেস এতে আর কোন আপত্তি জানাল না। বিজয় গর্ব্বে গর্ব্বিত মিঃ জিন্না আনন্দ সহকারে পরিষদে যোগ দিলেন। ঐ-ই পাঁচটি মুসলিম সিট্ বণ্টনে মনোনীত করলেন, মিঃ লিয়াকাত আলি, মিঃ আব্দুলরোব নিস্তার, মিঃ গজনফর আলি, মিঃ সি, আই চুন্দ্রীগড় ও বাকি একটি সিট্ হিন্দু সিডিউল কাষ্টের হিন্দু সিট্ রূপে বণ্টন করলেন মিঃ যোগেন মণ্ডলকে।

এতে এক শ্রেণীর মুসলিম ভাই বললেন, মুসলিম সিট্ থেকে হিন্দুকে সিট্ দেয়া হ'ল কেন? কতক হিন্দু বললেন, তপসীলিদের মুসলমান করে নেবার মিঃ জিন্নার আর একটি চাল। এ ধরণের দ্বিধা দ্বন্দ্বভাব যখন সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, তখন এ আলোচনা বন্ধ করতে গান্ধীজী বললেন, 'লীগ যখন তাঁদের সিট্ থেকে একটি সিটে যোগেন মণ্ডলকে মনোনীত করেছেন, তখন বেশ বুঝা যাচ্ছে যে, লীগ সোজা মনে পরিষদে যোগ দেননি'।

গান্ধীজীর এরূপ ভাষণে একদল লীগপন্থী বুঝলেন যে, গান্ধীজী যখন স্বয়ং এতে অস্বস্তি প্রকাশ করেছেন, তখন বেশ বুঝা যাচ্ছে, মিঃ জিন্না কংগ্রেসের ঠিক জায়গায় আঘাত করেছেন।

নিশীথ বললে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান কেউই বুঝলেন না যে, মিঃ জিন্নার এ ভাবে সিট্ বণ্টনে লীগ পুরাপুরি কংগ্রেসের মতেই চলেছেন এবং একই সঙ্গে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের ওপর। মিঃ জিন্না যেন অবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে বলছেন, হে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু! রক্ষা কর তোমাদের নিম্ন শ্রেণীকে। হাত ধরে, তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বল যে, আমরা আর তোমাদের অস্পৃশ্য মনে করে আমাদের থেকে তফাৎ মনে করব না।

তোমরা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, আমাদের অসহায় ও দুর্ব্বল করনা। বিভূতি বললে, কি হে নিশীথ! তুমি যে গান্ধীর মত জিন্নার প্রেমে পড়েছো। প্রায় ত্রিশ বছরের বিরুদ্ধ মতকে এক পথে চালিত করছো?

শচীনদা বললে, বাহ্যক ভাবে গান্ধী জিন্নার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ পেলেও ভেতরে কিন্তু ওঁদের দলের মধ্যে মতের কোন বিরোধীতা নেই। এর একটি নাটকীয় নজির দেখাচ্ছি।

জহরলাল যেদিন পরিষদ অধিবেশনে বসে সকল সদস্যকে জানালেন, 'আমার পার্শোন্যাল সেক্রেটারী মিঃ কৃষ্ণমেননকে ভারতীয় দূতরূপে রাশিয়ায় মলোটভের কাছে পাঠিয়ে ছিলুম। আমাদের পত্রের আদান-প্রদানে মিঃ মলোটভ্ জানিয়েছেন যে, ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে এক নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং আরো কিছু জানিয়েছেন যা' এখন আমরা গোপন রাখতে চাই'।

এর জোরাল প্রতিবাদে ধুরন্ধর লীগ সদস্য মিঃ গজনফর আলি পণ্ডিতজীকে অতি রুক্ষভাবে প্রশ্ন করেন, 'কাদের মত নিয়ে মিঃ মেননকে ভারতের দূতরূপে রাশিয়ায় পাঠান হয়েছিল?' এর উত্তরে পরিষদে বসেই পণ্ডিতজী বলেন, 'আমাদের পরিষদের সকল সদস্যদের সর্ব্বসম্মতি-ক্রমেই মিঃ মেননকে রাশিয়ায় পাঠান হয়েছিল। একথা শুনে লীগ ও কংগ্রেস দু'দলই আকাশ ফাটান উচ্চ হাস্য করল। এর অর্থ? নন্দদা বললে, ঠিকই তো। মিঃ জিন্নার দক্ষিণহস্ত বিচক্ষণ লীগ সম্পাদক কায়েদে মিল্লাত নবাবজাদা লিয়াকাত আলি কংগ্রেসের সম্পূর্ণ বিরোধী দলের নেতা হয়েও, পরিষদের কার্য্যারম্ভে প্রথমেই মহাত্মার তুষ্টির জন্যে 'লবনকর' উচ্ছেদ করলেন এবং মুসলিম লীগ মাইনরিটি দল সত্বেও লীগ বিরোধী কংগ্রেস দলের সদস্যরা লিয়াকাত রচিত পরপর তিনখানি করধার্য্য বিলের সবগুলিই বিনাবাধায় গৃহীত হতে দিলেন কেন? লীগের ওপর কংগ্রেসের

· কিসের নির্ভরতা?

এত ঘটনা ঘটাতেও কি আমরা অবুঝের মত কিছুতেই বুঝব না যে, দেশের সর্ব্ব জাতির কল্যান কামনায় সর্ব্বদলীয় নেতাদের উদার চিন্তা ও সুস্থির পবামর্শ ক্রমেই সকল কার্য্য সমাধা করা হচ্ছে ?

নন্দদা বললে, তা'তো হোল। এ দিকে কিন্তু মিঃ জিন্না তো গণ পরিষদে যোগ দিলেন না। লীগ শেষে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব গ্রহণের সম্মতি প্রত্যাহার করে নিয়ে ১৬ই আগষ্ট (১৯৪৬) 'ডাইরেক্ট্‌ এক্সান ডে' পালন করবে বলে ঘোষণা করেছে।

অষ্টাদশ পর্ব

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের অবসান

রাত্রে প্রহরা ঘাঁটিতে গিয়ে শুনছি, ভারতের কিছু সংখ্যক মুসলমান অবিভক্ত ভারতে মিলে মিশে শান্তিতে বসবাস করতে চাইছেন না। দেশ ভাগ নাকি করতেই হবে।

অথচ ভারতের হিন্দু মুসলমান দু'টি জাতির ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক হ'লেন একটি মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী অপরটি হ'লেন কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্না, এই দুই কর্ত্তা যেন অখণ্ড ভারতের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে বিয়াই মশাই। এঁদের উভয় দলের কার্য্যভার বণ্টন যেন লৌকিকতার আদান প্রদান।

মহামান্য বৃটিশ সরকার প্রদত্ত 'খেতাব' কংগ্রেস যেই পরিত্যাগ করলো, লীগও তাদের 'খেতাব' গভর্ণমেণ্টের ঘরে ফিরিয়ে দিলো। যার ফলে ১৯৪৭ সালে বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের 'খেতাব' দেওয়াই তুলে দিলেন।

অথচ এখানে আমাদের মনে রাখার কথা যে, মহাত্মা গান্ধী প্রদত্ত 'কায়েদে আজম' (প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ নেতা) খেতাবটি তেজস্বী বেপরোয়া বিচক্ষণ নেতা হ'য়েও মিঃ জিন্না গৌরবের সঙ্গেই ধারণ করে রইলেন, এতে করে মিঃ জিন্নার গান্ধীজীর প্রতি যেটুকু ভক্তি, প্রীতি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পাচ্ছে, তা'তে কি মিঃ জিন্না অন্য সকল দেশ নেতার মতই ভারতের গান্ধীজীকে 'বাপুজীর' চক্ষেই দেখতেন বলে মনে হয়না। ?' এটা অখণ্ড চিন্তার অন্যদিক।

অন্যদিকে ভারতের এই সাংঘাতিক রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

মীমাংসার জন্যে লণ্ডনে একটি বৈঠক অহূত হল। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লী স্বয়ং পত্র লিখে ভারত নেতাদের নিমন্ত্রণ জানালেন, মিঃ জিন্না পণ্ডিত জহরলাল, মিঃ বলদেও সিং, মিঃ লিয়াকাত আলি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে। এ নিয়ে সারা ভারতে একরকম বেশ সোরগোল পড়ে গেল। সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হল ওই সব ভারত নেতাদের ওপর। তা'তে দেখা গেল যে, এঁরা সবাই প্রধান মন্ত্রী এট্‌লীর আহ্বানে দাঙ্গা মিমাংসা বৈঠকে যোগদানের জন্যে লণ্ডনে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু এঁদের লণ্ডন যাত্রার ঢীমে-তেতালা ভাবগতিক দেখে মনে হয়, যেন এঁরা সবাই ভাবছেন, আমাদের এই তুচ্ছ দাঙ্গা মেটাবার জন্যে সাহায্য নিতে যাব লণ্ডনে? যেন এ দাঙ্গা বাঁধান ও মেটানোর এঁরাই একরকম কর্ত্তা।

তথাপি এঁদের লণ্ডন যাত্রা, একান্তই মিঃ এট্‌লীর সম্মান রক্ষার্থে। তাই এই লণ্ডন যাত্রার সুযোগে মিঃ লিয়াকাত আলি ষ্টার্লিং ঋণের নথি-পত্তর সঙ্গে নিয়ে চল্লেন। ইচ্ছে বোধহয়, লণ্ডন ভ্রমণ শেষে একেবারে সবাসরি সরকারের ঘরেই ঋণের তাগিদ্‌টা দিয়ে আসবেন বলে। কার্য্যতঃ হোলোও তাই। এতে করে লণ্ডনের সাদা আদমীরা নিশ্চয় মনে মনে ভাবলেন যে, কালা আদমীদের কি অভূত পূর্ব্ব সাহস!

এদিকে সরকার ভালভাবেই লক্ষ্য করছেন, যে, গান্ধী-জিন্নার কথায় দাঙ্গা যেমন থামে, আবার দাঙ্গা লাগালে বেশ জোর করেই লাগে। দেশের আপামর জন সাধারণ যেন এক সুতোয় বাঁধা 'তারের পুতুল'। স্বাধীনতা অর্জ্জনে হিন্দু-মুসলমানের এ রকম একতার শৃঙ্খলা দেখলে বৃটিশ সিংহ ভয় পাবেনাইবা কেন?

ওদিকে শোনা যাচ্ছে, বড়লাট লর্ড ওয়াভেল্ ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মোটেই থামাতে পারছেন না। এই ব্যাপার সমস্ত রাজশক্তিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। দেশের মধ্যে অরাজকতা ব্যাপক ভাবেই চলছে। বৃটিশ প্রশাসন যন্ত্র ক্রমেই বিকল হ'য়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় ভারত নেতারা বিরক্ত হ'য়ে লর্ড ওয়াভেলকে যেন ধিকার দিয়েই বললেন যে,

'প্রশাসন যখন চালাতে পারছেন না, তখন একাজ আমাদের হাতে ছেড়ে দিন।' এধরণের নানা দিক থেকে অপমানকর অসুবিধার মধ্যে পড়ে ও প্রশাসন চালাতে একেবারেই অক্ষম হ'য়ে শেষে বাধ্য হয়েই ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল পদত্যাগ করলেন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ এবং এঁর জায়গায় বড়লাট হয়ে আসছেন এ্যাডমিরাল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন্। ইনিই বর্ম্মা সীমান্তের লড়ায়ে ব্রিটিশ সেনাপতি ছিলেন।

তখন থেকেই ভারত নেতারা সকলে ভাল করেই জানেন যে, বৃটেনের কবল থেকে ভারতকে মুক্ত করতে ইম্ফলে নেতাজীর যুদ্ধ প্রাথমিক ভাবে 'স্বাধীনতা' সংগ্রামে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ইম্ফলের ঐ যুদ্ধে সতেরো হাজার জাপানী সৈন্য সহ নেতাজীর ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মির (আই, এন, এ) অর্দ্ধেক সৈন্য নিহত হয়েছেন। বর্ম্মা সীমান্তে ব্রিটিশ সেনাপতি মাউন্ট ব্যাটেনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী প্রবল ভাবে যুদ্ধ করে ব্রহ্মদেশ অধিকার করে। এর পর হতে ভারত নেতারা যেমন মর্ম্মাহত, তেমনই মাউন্টব্যাটেন ও ব্রিটিশ বাহিনীর ওপর খুবই বিরক্ত। তাই এখন অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী সকলেই নতুন পদক্ষেপের চিন্তা করছেন।

কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের পরোক্ষ সংগ্রাম ও মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রবাহ যখন স্বাধীনতার সিংহ দ্বারে উপনীত, তখন ভারত নেতারা স্বাধীনতা পাবার আগেই, স্বাধীনতা রক্ষা করার চিন্তা করছেন। চক্রবর্ত্তী রাজা গোপাল আচারী একবার প্রস্তাব করেছিলেন, মুসলমান প্রধা অঞ্চলগুলিতে গণভোট মাধ্যমে দেখা উচিত যে, কারা এবং কতলোক পৃথক রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' চান।

মিঃ জিন্নার মনে এখন এই প্রশ্ন জেগে উঠল। তাই অবিভক্ত ভারতের মুসলমানদিগের স্পষ্ট মতামত জানতে লীগনেতা মুসলমান প্রধান অঞ্চলে, কল, কারখানায়, সকল মুসলিম প্রতিষ্ঠানে সারা ভারত ব্যাপী এক [illegible] সার্কুলার পাঠালেন। যাঁরা স্বদেশ ত্যাগ করে গিয়েও

'পাকিস্তান' নামে ভিন্ন নতুন রাজ্য তৈরী করে সেখানে বসবাস করতে চান, তাঁদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীন মতামত লিখে পাঠান হোক।

এই সারকুলার নিয়ে মুসলিম সমাজে সাড়া পড়ে গেল। তৎপরতার সঙ্গে লিখিত ভাবেই জানা গেল যে, অন্ততঃ ছয় কোটির ওপর মুসলমান নতুন রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' চান। এতে লীগ নেতা ও ভারত নেতারা সমস্যায় পড়লেন। গান্ধীজী সব দিক্ বুঝে নীরব হয়ে গেলেন!

ছয় কোটির ওপর মুসলিম স্বাক্ষর দেখে মিঃ জিন্নার 'পাকিস্তান দাবী' আর নিরীহ প্রস্তাব রূপে রইল না। এবার জিন্না অভিভক্ত ভারত রাখা তাঁর এই অন্তরের গোপন ইচ্ছা বদল করতে বাধ্য হলেন। কারণ জিন্না সাহেব মাঝে মাঝে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। এ অবস্থায় স্বাধীনতা পেতে হলে ও তাকে সু-শৃঙ্খলে রক্ষা করতে হলে ছয় কোটির ওপর বিরোধী মনের মানুষকে জোর করে একজায়গায় রেখে তাড়াতাড়ি মনের পরিবর্ত্তন করা যাবেনা। কাজেই এ সমস্যার সমাধান করতে দেশ ভাগ করে 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র গড়ে তুলতেই হবে। নয়তো স্বাধীনতা পেয়েও অনতি বিলম্বেই স্বাধীনতা হারাতে হবে। তাই মিঃ জিন্না এখন সুস্থির সিদ্ধান্ত নিলেন ও রেডিও মারফৎ বক্তৃতা দিলেন।'

'হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম আলাদা। সামাজিক চালচলন জাতির কৃষ্টি সব যখন আলাদা, তখন মুসলিমদের জন্যে ভিন্ন এক 'স্বতন্ত্র রাষ্ট্র' চাই। অন্যথায় হিন্দু ও মুসলমানের মনের দ্বন্দ্ব মেটানো যাবে না।'

মিঃ জিন্নার রেডিও বক্তৃতা শুনে হিন্দু বিদ্বেষী মুসলিম ভায়েরা খুব উৎফুল্ল হলেন। জাতীয়তা বাদী মুসলিম ও হিন্দুরা সাম্প্রতিক হাঙ্গামার হাত থেকে জীবন রক্ষার আশায় খুশী হলেন। অন্যান্য দেশ নেতারাও খুশী হলেন এই ভেবে যে, এতদিনের দেশ উদ্ধারের সংগ্রাম শেষ করে, স্বাধীন ভারত দেখে, স্বাধীন ভারতেই আত্ম তৃপ্তির সঙ্গে বসবাস করতে পারবেন।

এবার মুসলিম লীগের তরফ থেকে জোর প্রচার আরম্ভ হোল। তাঁরা বললেন, মুসলিম ও হিন্দুর পরস্পরের ধর্ম্মীয় শিক্ষা এবং সংস্কৃতির তফাতের জন্যে মুসলিমদের ভিন্ন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। এতে যেমন প্রতি কাজে, আচারে বিচারে দ্বন্দ্ব লেগে থাকবে না, তেমন আধুনিক জগতের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলার সঙ্গতি ও জ্ঞান অর্জ্জনে সকলে আগ্রহী হবে এবং এইভাবে দেশ ও জাতি প্রগতির পথে দ্রুত অগ্রসর হতে পারবে। এই সঙ্গে তাঁরা আরো বললেন, 'দেশ ভাগের সঙ্গে সকল সম্পদ সহ দেশের নাগরিক ও সকল সমর সম্ভার ভাগ করে দিতে হবে। মানুষ গুলিকে বন্ধক রেখে স্বাধীনতা লাভ করলে, বন্ধকী মানুষগুলির জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনা থেকে যাবে। তাই উচিত হবে, যাঁরা স্বইচ্ছায় দেশ ছেড়ে চলে যেতে চান, তাঁদের কোন বাধা সৃষ্টি না করা। এইভাবে দেশ বদলের ফলে বহুকালের পরিত্যক্ত গ্রাম ও পতিত জমিগুলি যেমন শহর হবার সুযোগ পাবে, তেমন গ্রাম ও শহরের যোগাযোগে দেশ ও সকল মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র নতুনভাবে গড়ে উঠবে।

লীগের এভাবে প্রচারকার্য্য চলাতে দাঙ্গার গোলমাল একটু কমে এলো। মাঝে মাঝে কলকাতায় ও বাহিরের দিকে হাঙ্গামা বাধে আর তার প্রভাবে এখানকার মুসলিম ভাই কেউ কেউ চঞ্চল হয়ে ওঠেন। অনেকে প্রশ্ন করেন যে, দেশে আবার হাঙ্গামা হচ্ছে কেন? উত্তরে বলি, গান্ধীজী বহুবার মিনতির সঙ্গে বুঝিয়ে বলেছেন,

'সাম্প্রদায়িক ঐক্য বাহিরের বস্তু নয় এবং জোর করে কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। ঐক্যের অর্থ হৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য যোগ। তাই ঐক্যের পথ হিংসা নয় মারামারিও নয় এর জন্যে মানুষকে হতে হবে আরো মহৎ, আরো বেশী করে ক্ষমাশীল।'

আমরা কিন্তু এর ঠিক বিপরীত আমাদের মনোবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি যেন এক গহ্বরে পড়ে আছে। তাই আমাদের শতযুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমান দেখিয়েও [illegible] পুরানো সংস্কারের একটুও বদল করতে চাইছিনা।

নন্দদা বললে, এর অন্য কারণ আছে। দেখো জ্ঞানী মানুষের কাছে সংস্কার বা রাগ দ্বেষ এসবই যেন জলের দাগ, যুক্তি দেখালে সহজে বদল করা যায়। কিন্তু অজ্ঞানীদের কাছে সংস্কার বা রাগ দ্বেষ যেন কালির দাগ, তাই এ দাগ সহজে ওঠান খুবই শক্ত।

১৯৪৭ সালে ২২শে মার্চ্চ ভারতের ভাগ্য পরিবর্ত্তন করতে এলেন লর্ড লুই মাউন্ট-ব্যাটেন। ইনি মহামান্য মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্র-দৌ-হিত্র। ভারতের পক্ষ থেকে পণ্ডিত জহরলাল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সসম্মানে অভিনন্দিত করলেন।

পত্রিকায় প্রকাশ পেল যে, লেডী মাউন্ট-ব্যাটেন বলেছেন, তাঁর স্বামী মিঃ মাউন্টব্যাটেন ভারতের সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের জন্যই এসেছেন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে। এখন তা'হলে মনে করা যেতে পারে ইনিই হ'লেন ইংরাজ শাসিত ভারতের শেষ বড়লাট।

ভারতের পক্ষে দেখা যাচ্ছে যে, কংগ্রেসের গত বাষট্টি বছরের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও সাধনা 'বন্দেমাতরম্' থেকে 'জয়হিন্দে' এর মোড় ঘুরল। এইবার এর শেষ হবার পালা আসছে। অর্থাৎ আর এক মহাভারতের যুদ্ধ পর্ব্ব শেষ হচ্ছে। তাই বোধহয় এখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মহাত্মা গান্ধী গোটা ভারতবর্ষের সকল কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্বের 'লাগাম্' পুরোপুরি জিন্না ও জহরের হাতে তুলে দিয়ে, এবার দর্শকের ভূমিকা নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'লেন।

এখানে মনে করা বোধহয় আমাদের অন্যায় হবেনা যে, ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষস দলনের জন্য স্বয়ং সশস্ত্র সংগ্রাম করেছেন। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ দুষ্ট দমনে নিরস্ত্র থেকেও একবার কিন্তু নিজের হাতে অস্ত্র ধারণে বাধ্য হয়ে ছিলেন। আর কলিযুগে মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ অসুর দলনে বরাবর অহিংস ও নিরস্ত্র যুদ্ধ করলেন। অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রাম চর্তুর্দিক থেকে করালেন কিন্তু নিজে বরাবর অহিংস ও নিরস্ত্র রইলেন। এখানে

গান্ধীজীর মধ্যে ঈশ্বর প্রেরিত অবতারের শক্তি আছে বলে প্রকাশ পাচ্ছেনা কি ?

এদিকে লর্ড লুই মাউণ্ট ব্যাটেন একে একে পণ্ডিত জহরলাল, রাজা গোপাল আচারী, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ আরো সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও উপদেষ্টা রাজনীতিবিদ্‌দের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ-আলোচনা করলেন। এই আলোচনার মাধ্যমে মাউণ্ট-ব্যাটেন দেশের সকল দলের নেতাদের একতার বিষয় বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করলেন। বুঝলেন যে, গাভী নানা রংয়ের হলেও সকলের দুধের রং কিন্তু এক রকমেরই সাদা।

এরপর মহাত্মা গান্ধী ও কায়েদে আজম জিন্নাকে বড়লাট স্বয়ং সরা-সরি আমন্ত্রণ লিপি পাঠালেন। মহাত্মা এলেন বড়লাট প্রাসাদে। এর ক'দিন পরে এলেন কায়েদে আজম জিন্না এবং যোগ্য সম্মানে বড়লাট বাহাদুরকে সম্মানিত করলেন।

লাটপ্রাসাদ ত্যাগ কালে মহাত্মাজী এশিয়া মহা সম্মেলনে আহুত হন। অধিবেশনের প্রথম সভাপতি ভারতের রাজনীতি বিশারদ বিদুষী শ্রেষ্ঠা সরোজিনী নাইডু ও ভারতের যোগ্য অতিথি ডঃ শারীর প্রমুখ নেতৃ-বৃন্দের অনুরোধে মহাত্মাগান্ধী একটি ছোট্ট করে বক্তৃতা দেন। মহাত্মাজী বলেন, 'বক্তৃতা দেবার দিন উঠে গেছে। এখন দেশের জন্যে গঠনমূলক কাজ চাই। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের তথা সমগ্র এশিয়াবাসীর পূর্ণ মিতালী চাই। এমন সম্পর্ক স্থাপিত হবে যে, যা'তে জগতের মধ্যে প্রমানিত হয় যে, এশিয়া বাসীরা এক মহত্বর ও শান্তিকামী জাতি। এরা গুণ্ডারাজকে ধ্বংস করে ঈশ্বরের রাজ্যে পরিণত করতে চায়।' সভাস্থ সকলে চোখ বুজে মহাত্মাজীর বাণী শুনলেন এবং সকলে তা' মুখ বুজে করবেন ব'লেও মনে হয়।

এদিকে লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেন ভারত নেতৃবৃন্দ ও মিঃ ভি, পি, মেননের

সঙ্গে ঘন ঘন বৈঠক করতে লাগলেন। শেষে কি বুঝে তাঁর আগের পরিকল্পনা বাতিল করে, ১৮ই মে লর্ড ও লেডী মাউন্টব্যাটেন লণ্ডন ছুট্‌লেন এবং আর এক নতুন খসড়া পত্র' এট্‌লী মন্ত্রিসভায় তড়িঘড়ি অনুমোদন করিয়ে ৩০মে (১৯৪৭) ভারতে ফিরে এলেন।

লর্ড ও লেডী মাউন্ট ব্যাটেন এবার দিল্লীতে পা দিয়েই তাঁদের নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী অভীষ্ট কার্য্য আরম্ভ করে দিলেন। ভারত নেতাদের জানালেন, '১৫ই আগষ্ট (১৯৪৭) ভারতের শাসন ক্ষমতা (ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস) হস্তান্তর করা হবে। দেশে শান্তি আনতে দেশ ভাগ মেনে নেওয়া হবে ও দু'টি ডোমিনিয়নের মাত্র একজন গভর্ণর জেনারেল থাকবেন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের অনুষ্ঠান দিল্লীতেই অনুষ্ঠিত হবে।'

এ প্রস্তাবে গান্ধী ও আজাদ ব্যতীত সকল কংগ্রেস নেতা সম্মত হলেন। কিন্তু মিঃ জিন্না এ প্রস্তাবে বাদ সাধলেন। কারণ মিঃ জিন্নার মনে মনে ইচ্ছে—স্বাধীনতা পাবার পর তিনি ব্রিটিশের কুক্ষীগত হয়ে থাকতে চান না, ও দ্বিতীয়তঃ জিন্না তাঁর জন্মভূমি করাচিতেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্বোধন করাতে চান। তাই মিঃ জিন্না দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'হিন্দুস্থান উদ্বোধনের আগে 'পাকিস্তান রাষ্ট্রের' উদ্বোধন করাচিতে গিয়ে করতে হবে এবং পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হ'বো স্বয়ং আমি নিজে। অন্য কাকেও গভর্ণর জেনারেল করা হবেনা।' এ যেন মিঃ জিন্নার দ্বন্দ্ব পাকিয়ে তোলার মত কথা। কিন্তু সকল অবস্থা বুঝে সুচতুর লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন কোন দ্বন্দ্বের মধ্যে না গিয়ে মিঃ জিন্নার প্রস্তাবই মেনে নিলেন। তাই ১৩ই আগষ্ট লর্ড ও লেডী মাউন্ট ব্যাটেন সদলবলে করাচি যাত্রা করলেন। ১৪ই আগষ্ট (১৯৪৭) মহাসমারোহে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্বোধন উৎসব সুসম্পন্ন করা হোল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের গভর্ণর জেনারেল হলেন কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্না। এরপর লর্ড ও লেডী মাউন্ট ব্যাটেন সদলবলেই ফিরে এলেন দিল্লীতে।

১৪ই আগষ্ট দিল্লীতেও স্বাধীনতার উৎসব চলছে। সন্ধ্যা ...

সর্ব্বত্র আলোক মালায় হোল সমুজ্জ্বল। দিকে দিকে আনন্দ উৎসবের কলধ্বনি। গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, দিকে দিকে রাজপথে লতায় পাতায় পুষ্পে পুষ্পে তোরণ করা হয়েছে। আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হয়েছে দিল্লী শহর। এমন এক শুভ লগ্নের প্রাক্কালে ১৪ই আগষ্টের (১৯৪৭) মধ্য রাত্রে দিল্লীস্থিত একটি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শান্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণপরিষদের অধিবেশন বসল। সেই অধিবেশনে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ্ এর অংশ হিসাবে 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা' ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হল ১৫ই আগষ্ট (১৯৪৭)

দেশের পরিস্থিতি ও দেশের লোকের মতামতের ওপর দেশ ভাগা-ভাগি আগেই করা হয়েছে। পূর্ব্ববঙ্গ, শ্রীহট্ট জেলার কিছু অংশ পশ্চিম পাঞ্জাব, বেলুচিস্থান, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও পরে অর্দ্ধেক কাশ্মীর এই নিয়ে গঠিত 'পাকিস্তান', এবং ভারত উপমহাদেশের অবশিষ্ট অংশ নিয়ে হ'ল ভারত।

ব্রিটিশ সরকার আইনের মাধ্যমে ভারতের শাসন ক্ষমতা দুইভাগে ভারতবর্ষকে ভাগ করে সত্যিসত্যিই লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেন ভারতীয়দের হাতে তুলে দিলেন 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা' এইভাবে নতুন দুইটি রাষ্ট্রের জন্ম হল। পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল যেমন হয়েছেন কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্না, তেমন ভারতের গভর্ণর জেনারেল প্রথম হলেন স্বয়ং মাউণ্ট ব্যাটেন ও জহরলাল নেহেরু হলেন ভারতেব প্রধান-মন্ত্রী। এরপরে চক্রবর্ত্তী রাজা গোপাল আচারী হলেন ভাবতের গভর্ণর জেনারেল। **এখানেই হোল ভারতে ইংরাজ রাজত্বের অবসান।**

এরপর হতেই ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তানের ও ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস উৎসব পালিত হয়ে চলেছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেই আমাদের মনে হতে লাগল স্বাধীনতা কামী সংগ্রামী শহীদদের আত্মদানের কথা। মনে হতে লাগল তাঁদের প্রাণান্ত সংগ্রাম। হাসি মুখে মরণের দণ্ড। চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল শহীদদের

লক্ষ লক্ষ মুখচ্ছবি। মনে হতে লাগল তাঁরাও যেন আজ স্বর্গদ্বারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আনন্দ করছেন। তাঁদের মধ্যেও যেন পড়ে গেছে আজ আনন্দের ধুমধাম। তাঁদের মধ্যে অনেকের অমর আত্মা এসে যেন আমাদের অন্তরে মিশে সবার সাথী হয়েছেন। আমরাও আজকের মহোৎসবের শুভক্ষণে তাঁদের মহান আত্মার প্রতি সমবেত ভাবে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই, প্রনাম জানাই, করি আজ তাঁদের সঙ্গে প্রানভরা আলিঙ্গন এই সঙ্গে প্রার্থনা জানাই তাঁদের অমর আত্মা যেন তৃপ্ত হয়, পান যেন তাঁরা অফুরন্ত শান্তি।

আমরা এদেশের লোক হ'য়েও স্বাধীনতা অর্জ্জনের শেষ পর্য্যায়ের কোন ঘটনাই জানিনা। তাই আমাদের দেশের তা' বড় বড় পণ্ডিত ও বিশিষ্ট বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে, কংগ্রেস এ দেশের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছিল, আর মুসলিম লীগ সৃষ্টি করেছে শুধু অশান্তি ও হানাহানি। কিন্তু তা'নয়। দেশকর্ম্মীরা বলেন, গান্ধীজীর আজীবন সানুনয় অনুরোধ আমাদের দেশবাসী ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ যখন উপেক্ষার সঙ্গে সবটাই প্রত্যাখ্যান করলেন, তখনই মিঃ জিন্নাব 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' অস্ত্র প্রয়োগই হোল সর্ব্বশেষ তার সঠিক উত্তর। এতেই ইংরাজ ভারত ছাড়তে বাধ্য হলেন।

গত ৬২ বছর ধরে নানা ভাবে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনা-প্রবাহ চলে আসছে। শেষ পর্য্যন্ত দেখাগেল বৃটিশ সরকার ভারতবাসীদের 'স্বাধীনতা' দিতে বাধ্য হলেন। এখন তাই ভাবছি, সব দিক ভাল ক'রে খতিয়ে দেখলে, সবাইকেই বলতে হবে যে, দেশ ভাগ ও স্বাধীনতা কায়েমের পরিস্কার 'গোল' দিলেন আমাদের জনাব কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্না।

এদিকে ভারতের স্বাধীনতা পর্ব্ব শেষ হো'ল, লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেন তখন ভারতের গভর্নর জেনারেল। তৎ সত্ত্বেও তখনও দেশের মধ্যে ব্যাপক ভাবেই চলছে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

এই হানাহানি ক্রমশঃ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। হানাদারেরা কাশ্মীরের পথেও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু করলেন। তখন দেশের প্রায় সকল লোকই বলছেন যে, এ হানাহানি মাউন্ট-ব্যাটেন করাচ্ছেন। কিন্তু তা'নয়।

গান্ধীজী একদিন তাঁর প্রার্থনা সভায় বলেছেন, 'হিন্দু ও মুসলমানেরা নিজেদের মধ্যে যদি হানাহানি করে ও দেশ ভাগ মেনে নেয়, তা'হলে তা'তে ভাইসরয়ের করবার কি থাকতে পারে? দেশ ব্যবচ্ছেদ এবং হানাহানির জন্যে ইংরেজরা দায়ী নয়।'

জিন্না মারা যাবেন জানা গেলে ভারতবর্ষ ভাগ হতনা

নয়াদিল্লী, ১৭ই নভেম্বর ১৯৪৭। যদি লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেন জানতেন যে, মহম্মদ আলি জিন্না যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত এবং তিনি দু'এক বছরের বেশী বাঁচবেন না, তবে হয়তো ভারতবর্ষকে দু'ভাগে ভাগ ক'রার ব্যাপারটা এ্যাড়ানো যেত। এই মত ব্যক্ত করেছেন দু'জন বিদেশের রাজনীতি গবেষক 'মাঝরাতের স্বাধীনতা' নামে সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁদের বইয়ে।

এরা বলেছেন, 'জিন্নার রোগের কথা জানতেন মাত্র দু'জন। বোম্বায়ের ডাঃ জে, এন, প্যাটেল এবং জিন্নার বোন ফতিমা। বলা যেতে পারে, ডাঃ প্যাটেল জিন্নার যে এক্সরে ছবিটি খামে সীল্ করে রেখে দিয়ে ছিলেন, তা'থেকে পরিস্কার বোঝা যেত ৭০ বছরের জিন্না যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত এবং দু'এক বছরের বেশী তিনি বাঁচবেন না। সেটা আগে ভাগে জানা গেলে এশিয়ার ইতিহাসটা নিশ্চয়ই অন্য ভাবে লেখা হোত। এই তথ্য এমন ভাবে গোপন করা হয়েছিল যে, পৃথিবীর সব চেয়ে কার্য্যকর ব্রিটেনের গোয়েন্দা দফ্তরের এজেন্সী গুলোও তা' উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছে।

লেখকরা বলেছেন 'জিন্নার সঙ্গে ১৯৪৭ সালের এপ্রিলের প্রথম পনের দিনে লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেন ছয়টি বৈঠকে বসেছিলেন। এর আগে তিনি, নেহেরু, গান্ধী এবং প্যাটেলের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। ভাইসরয় প্রায় বলেছেন যে, আমার যত রকমের ছল্-চাতুরী করা সম্ভব সবই

করেছিলুম জিন্না যাতে দেশ বিভাগ না চান কিন্তু জিন্নার কাছে কোন যুক্তিই খাটেনি। তাঁর স্বপ্নের পাকিস্তান পাবার জন্যে তিনি ছিলেন বদ্ধ পরিকর।

মাউন্ট-ব্যাটেন বলেছেন, 'সব ব্যাপারে তিনি ছিলেন এক অশুভ প্রতিভা। আমি ভাবতেই পারিনা যে, একজন বুদ্ধি দীপ্ত, সুশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ ব্যারিষ্টার মানুষ অন্য কোন কথা না ভেবে কেউ জিন্নার মত স্রেঃ চুপ করে বসে থাকতে পারেন। তিনি ব্যাপারটা যে বোঝেননি এমন নয়, সব বুঝে ছিলেন। কিন্তু কেমন একটা বন্ধ্যাত্ব ভাব তাঁর মাথায় চেপে বসে ছিল। অন্যদের হয়তো মানানো যেত, কিন্তু জিন্নাকে কখনও নয়। তিনি বেঁচে থাকতে কিছুই করা যেত না। মাউন্ট-ব্যাটেন বলেছেন, দেশ বিভাগ একটা পাগলামো। এইরকম সাংঘাতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না বাঁধলে এমন কাজ আমাকে দিয়ে কেউ করাতে পারত না। (ইউ, এন, আই) এর আরো কিছু দিন পরের খবর ঃ—

লণ্ডন, ২২শে অক্টোবর মাউন্ট ব্যাটেন বলেছেন, স্বাধীনতা দেওয়া ছাড়া বিকল্প কোন পথ খোলাছিল না। গোটা সরকারটাই ভেঙ্গে পড়েছিল। আমরা আব ধরে রাখতে পারছিলুম না। ব্রিটিশ শাসনকে আর একটা বছর টিকিয়ে রাখাও যদি সেদিন সম্ভব হোত, তাহলে আমি অন্যপথ নিতুম। জোড়া তালি দেবার কোন সুযোগই ছিল না। রাজাজীকে তিনি বলেছিলেন পূর্ব্ব পাকিস্তানের আয়ু মাত্র পঁচিশ বছর। রাজাজীও একথা মেনে নিয়ে ছিলেন।

পরে রাজাজী বলেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট এবং প্রধানমন্ত্রী যদি বৎসরে তিনমাস ছুটি নিয়ে পরস্পর পরস্পারের রাষ্ট্রে গিয়ে সেখানে থেকে ছুটির অবসর যাপন করেন, তা'হলে পাক ভারত মৈত্রী সুন্দর ভাবে গড়ে উঠবে ও সরকারী অফিসারদের মধ্যে এর সুফল দেখা যাবে।'

ইংরাজ রাজত্বের অবসান ও স্বাধীনতা অর্জনের পর মনে পড়ছে—একদিকে আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানহীন, দেশদ্রোহী জনাব মীরজাফরের (১৭৫৭)

২৩শে জুনের অপকীর্ত্তি ও অপরদিকে মহান মর্য্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন দেশপ্রেমিক জনাব কায়েদে আজম জিন্নার 'মাঝরাতের স্বাধীনতা' মহান কীর্ত্তির কথা। ভারতের এই দুই লোক নায়কের অপকীর্ত্তি ও মহান কীর্ত্তি দু'টি নিত্যকার রাত দিনের মত বরাবর পাশাপাশি থেকে যাবে ও ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল।

এরপরে (১৯৪৭) মহাত্মাজী আবার এলেন বিহারে। প্রার্থনা সভায় কোরাণ পাঠে গোঁড়া হিন্দুরা জনসভা ত্যাগ করলেন। মহাত্মাজী ধর্ম্মপ্রান মহামানব বুদ্ধদেব ও যীশুখৃষ্টের মত করজোড়ে বললেন, 'হিংসাবৃত্তির প্রতিশোধ নিতে গিয়ে কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-পুস্তককে ঘৃনা করা উচিত নয়। বিচার করে দেখলে বুঝবেন যিনি রাম—তিনিই রহিম। দুই-ই মূলে এক।

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ন্যায় মহাত্মাজীর সাধুবাদে স্বতঃই মনে হয় যে, গান্ধীজী বোধহয় ভারতবাসীদের কোন এক নতুন মহান ধর্ম্মে দীক্ষা দিতে চান।

তাই ভাবতে আমাদের আনন্দ হয় যে, মহাত্মাজীর মত মহামানব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। গর্ব্ব হয় এই বলে যে, তাঁর জন্মভূমি আমাদের ভারতবর্ষে, স্বস্তি পাই এই ভেবে যে, তিনি আজও ভারতের মাটিতে চলে ফিরে বেড়াচ্ছেন, সকলের সঙ্গে কথা বলছেন ও ভারতের অতি নগন্য সাধারণ লোকের সঙ্গেও বন্ধুভাবে মিশছেন।

তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে, ভারতের মুক্তিকামী, বিশ্বশান্তির দুত, নতুন ধর্ম্মের যুগাবতার, হে মহাসাধক মহাত্মা! তোমার কল্যানী আশা যেন সম্যক সিদ্ধিলাভ করে। তোমার মঙ্গলময় ধর্ম্মে যেন সারা বিশ্ব অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে।

ভারত স্বাধীন হবার পর দেখতে দেখতে তেত্রিশটি বছর কেটে গেল। কালের ক্রমগতিতে আমরা মহান্ নেতাদের একে একে হারালুম। এর

 ঘটালো অঘটন। চীনের সঙ্গে লড়াই, পাকিস্তানের সঙ্গে

যুদ্ধ, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম, রাজনৈতিক দল ভাঙ্গাভাঙ্গি ও তার স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ সত্বেও ভারতে 'গণতন্ত্র রাজ' আজো রয়েছে অম্লান।

সকল দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাঁদের রাজনৈতিক কর্ম্মদক্ষতার কৌশলে নানা দ্বন্দ্বাভিনয়ের মাধ্যমে দুর্নিবার গতিতেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, আজো তার বিরাম নেই। তাই মনে হয়, ভারতের সর্ব্ব ধর্ম্ম, বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল দলের জনগণ জাতীয়তা বোধের সঙ্গে দেশের ঐক্য শক্তি ও স্বাধীন ভারতকে সর্ব্ব সহযোগিতায় সকল ঐশর্ধ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ ক'রে অচিরেই স্বয়ম্ভর করে তুলবেন।

এইখানেই শেষ করলুম, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম কাহিনী। জানি, গ্রন্থটি রচনার নিন্দা ও প্রশংসা দুই-ই আমার প্রাপ্য। তবে গ্রন্থ বিচারের থাকে দু'টো দিক। একদিকে থাকেন শিল্পী ও অপর দিকে থাকেন সমঝদার পাঠক পাঠিকা। তাই গ্রন্থটি রচনার দোষ-গুণ সম্পার্কে কেউ কিছু অনুগ্রহ করে জানালে পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধন ও পরিমার্জনায় আমি সচেষ্ট হব।

আয়ুর্ব্বেদ কুটীর
৭৮, সূর্যসেন রোড,
কলিকাতা-৭০০০৩৫

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ

—সমাপ্ত—

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

আয়ুর্ব্বেদের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য সম্বন্ধে অভিমত

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ভারত বিখ্যাত ঐতিহাসিক পণ্ডিত শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার, জাতীয় অধ্যাপক মহাশয় বলেন ঃ—

"শ্রীবীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত আয়ুর্ব্বেদের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য গ্রন্থটিতে শারীর-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যরক্ষা ও আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সরল ভাষায় লেখা হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে সাধারণ লোক বিশেষ উপকৃত হইবেন।"

ভারতের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ভারত বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের 'ডীন্' অধ্যাপিকা ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায় **D. Sc., F.N.A.** বলেন ঃ—

"কবিরাজ শ্রীবীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, কবিরত্ন জ্যোতির্ভূষণ কর্ত্তৃক লিখিত আয়ুর্ব্বেদের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য নামক পুস্তকটি পড়লাম।"

প্রাক্ বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতের কয়েকজন প্রখ্যাত ঋষিতুল্য কবিরাজের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কিভাবে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছে-তার ইতিহাস এই পুস্তকটিতে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এবং সেই ইতিহাস বর্তমানের আয়ুর্ব্বেদ অনুরাগী জনসাধারণের জানার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষরূপী ত্রিধাতুর ভারসাম্য নিখুঁতভাবে জানার প্রধান সহায়ক হোল-নাড়ী বিজ্ঞান। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদের সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদের নাড়ী বিজ্ঞানের যে

নীতিগত পার্থক্য রয়েছে সেটা শ্রীচট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বহু জটিল তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আলোচনার মাধ্যমে শ্রীচট্টোপাধ্যায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করার চেষ্টা করেছেন। বর্ত্তমানের অবহেলিত আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি সাধন কল্পে গবেষণা ও একনিষ্ঠ সেবকের একান্ত প্রয়োজন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর পুস্তকে মূল্যবান, অতি সাধারণ অথচ অল্প আয়াস লব্ধ কয়েকটি 'টোট্কা' ছড়ার আকারে সন্নিবেশ করে বিত্তহীন জনসাধারণের বিশেষ উপকার করেছেন। আশাকরি, পুস্তকটি ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণের উপকারে এসে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতিকে আবার সকলের কাছে সমাদৃত করে তুলবে।"

Sri Sankar Prosad Mitra the Hon'ble chief justice of High Court of Calcutta has remarked :—

"The book is an interesting Guide to the ordinary man for maintaining his Health."

Acharya Provakar Chatterjee M.A. Bsc. F.R.C.S. (London) Member of Planing commission and Central counsel of Indian Medicine, Govt. of India বলেন :—

"আয়ুর্ব্বেদের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য শীর্ষক গ্রন্থখানি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বিগত ২০ বৎসরের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে এইরূপ সুলিখিত, সুচিন্তিত ও সুপ্রণীত গ্রন্থ পড়ি নাই।······দেশীয় সরকার আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে গ্রন্থ প্রণেতাকে পরামর্শ দাতারূপে নিযুক্ত করিলে লাভবান হইবেন।"

Dr. Tapan Kumar Chatterjee, M.B.B.S. D.G.O. (Cal) M.D. (Sheffield) M.R.C.O.G. (London) F.R. C.S. (Edin) Gynaecologist বলেন :—

আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থীদের এরূপ একটি পুস্তকের প্রয়োজন ছিল। লেখক গল্পের মাধ্যমে প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সম্বন্ধে পাঠকের সুন্দর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আমরা জানি যে, জ্ঞানের তখনই পরিপূর্ণতা লাভ হয়, যখন জটিল জিনিষ সোজা দু' চার কথায় কেউ ব্যক্ত করতে পারে। লেখক এই প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণভাবে সাফল্য লাভ করেছেন।

মাত্র ১৮০ পৃষ্ঠার মধ্যে লেখক আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীন ইতিহাস, শরীর বিজ্ঞান, রোগী পরীক্ষা, রোগের লক্ষণ ও রোগনির্ণয়, ভেষজ শাস্ত্র, বীজাণুবিদ্যা, ধাত্রীবিদ্যা, শিশু প্রতিপালন, মানসিকব্যাধি এমনকি পথ্যের ও পুষ্টি সাধনের ব্যবস্থা প্রভৃতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন।"

Ayurvedacharya Kaviraj Bagola Kumar Mozumdar M.A. Founder & President Ayurveda Bijnan Parisad & Founder & Editor 'Ayurveda Bharati Patrika' বলেন :—

"কবিরাজ শ্রীবীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন, জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় প্রণীত 'আয়ুর্ব্বেদের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য' নামক গ্রন্থখানি অত্যন্ত উপাদেয় ও তথ্য বহুল। গ্রন্থকার আয়ুর্ব্বেদের বিভিন্ন বিষয় প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থখানি প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পক্ষে জ্ঞানের উন্মোচন করতে সাহায্য করবে।

প্রাণাচার্য্য কবিরাজ শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, কেন্দ্রীয় সরকারের গবেষণাধ্যাপক, বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক মহাপরিষদের সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ুর্ব্বেদ ফ্যাকাল্টির সদস্য, কাব্য, ব্যাকরণ, ষড়দর্শন, তীর্থ বলেন :—

গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার যে ভাবে আয়ুর্ব্বেদের গবেষণা করিয়াছেন, তাহা কবিরাজ ও অকবিরাজ সকলেরই বুঝিবার ও জানিবার বিষয়। আয়ুর্ব্বেদ কলেজগুলিতে আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস একটি পাঠ্য বিষয়। এই বিষয়টি সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন কবিরাজ মহাশয়, ছাত্রেরা এই

পুস্তকটি অধ্যায়ন করিলে ত্রিদোষ তত্ত্ব ও ইতিহাস দুইটি পরীক্ষিতব্য বিষয় জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে।

বৈদ্যাচার্য্য কবিরাজ ৺অমল চরণ সেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ুর্বেদ ফ্যাকাল্টীর সদস্য, শ্যামা দাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ভিষক্ শাস্ত্রী বলেন :—

আয়ুর্বেদের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য পুস্তকটি সহজ, সুন্দর নুতন ভাবধারায় ও নুতন জ্ঞানধারায় সমৃদ্ধ। এই পুস্তকটি আয়ুর্বেদ প্রেমিক তথা ছাত্র সমাজের বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে।"

Dr. S K Bhattacharjee M.A. M.D.H, Msc., H.D.S C. (Homoeo) Trained in Family Planing বলেন :

"I have gone through the book and is satisfied as well as benefied by noting down some marvellous remidees and valuable instructions It would be helpful to all of my friends respective of 'Pathy' practising in Bengal and abroad"

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ রমা চৌধুরী M.A. D. Phil (Oxon) বলেন :

প্রেরীত পুস্তকটি পেয়ে ও পাঠ করে বিশেষ আনন্দিত হলাম। আয়ুর্বেদ একটি সর্ব্বজন সমাদৃত শাস্ত্র এবং সে জন্য এই মঙ্গল জনক শাস্ত্রের প্রচার কল্পে আপনার শুভ প্রচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়।"

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস শাস্ত্রে পণ্ডিত শ্রীসারদা মঠের সভাপতি (দক্ষিণেশ্বর) প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা মাতাজী বলেন :

"ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস শাস্ত্রের আমি দীন পাঠিকা। সেজন্য পুস্তকখানি হস্তে আসামাত্রই আয়ুর্বেদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিবিষ্টচিত্তে পড়িয়া ফেলিলাম। "মৃত্যুলক্ষণ" সংক্রান্ত অধ্যায়টির মধ্যে দেহত্যাগ

সম্বন্ধে নূতন সংবাদ পাইয়া সত্যই ভাল লাগিল। "নাড়ীবিজ্ঞান" সম্বন্ধে আমার আশৈশব অতি উচ্চ ধারণা ছিল সে ধারণা অধিক দৃঢ় হইল। পুস্তকখানি সত্যই আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে উৎসুক ব্যক্তির দৃষ্টি ও আগ্রহ আকর্ষণ করিবেই।"

যুগান্তর পত্রিকা (১৮।৩।৭৩) বলেন ঃ

"গ্রন্থকার অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের এই চিকিৎসা পদ্ধতির সাফল্য এবং ভেষজ ও শাল্য বিভাগে এর বৈজ্ঞানিক-প্রয়োগ বিশ্লেষণ করে বর্তমান যুগেও যে এর উপযোগিতা আছে, তা প্রমাণ করেছেন। আধুনিক চিকিৎসা প্রণালীর সঙ্গে তুলনা করে তিনি এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছেন।"

রাজেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায়

দৈনিক বসুমতী পত্রিকা (২৮।১।৭৩) বলেন ঃ

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পণ্ডিত কবিরাজ গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দৃষ্টি নিয়ে এবং নিজের অভিজ্ঞতার সহায়তায় আয়ুর্বেদের চিকিৎসা পদ্ধতি যে কি পরিমাণ সূক্ষ্ম ও বিজ্ঞানভিত্তিক তার সার্থক আলোচনা করেছেন এবং প্রত্যক্ষ উদাহরণ যোজনায় আলোচ্য বিষয়গুলি অধিকতর সরল হয়েছে। সমগ্র গ্রন্থটি চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়ক মনে হয়। আয়ুর্বেদের ছাত্রদের এটি অবশ্য পাঠ্যগ্রন্থ হওয়া উচিত।"

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা (জুন, ১৯৭৩) বলেন :—

আয়ুর্বেদ বিষয়ে বাংলায় লেখা বই বিরল। পুস্তকখানি মোটামুটি সরল বাংলায় রচিত হওয়ায় আয়ুর্বেদ বিষয়ক জ্ঞান আহরণে কিছুটা সহায়ক হবে। আঠাশটি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভিন্ন শিরোনামায় আয়ুর্বেদের প্রাথমিক তথ্য সঙ্কলনের মধ্যে প্রধানতঃ আয়ুর্বেদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, আয়ুর্বেদের পরিচয়, আয়ুর্বেদিক প্রকৃতি বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদিক ত্রিধাতু বিজ্ঞান শীর্ষক অংশ সমূহে আয়ুর্বেদের মূল তত্ত্বের

কিছু কিছু আভাস দেবার প্রচেষ্টা লক্ষনীয়। গ্রন্থটি আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে পাঠকের কৌতুহল ও অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক করবে। এজন্যে গ্রন্থকারের প্রাথমিক প্রচেষ্টা প্রশংসাহ

মানবেন্দ্র নাথ পাল।

চিকিৎসক সমাজ পত্রিকা (বর্ষ ৪ ফাল্গুন ১৩৭৯) বলেন :—

"গতানুগতিকতা ত্যাগ করে কবিরাজ বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৮টি অধ্যায়ের মাধ্যমে আয়ুর্ব্বেদের মূল্যবান তথ্যগুলি উপস্থাপিত করে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থী ও জনসাধারণের মধ্যে যাঁরা আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে চান তাঁদের জন্য এক মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন।'

আয়ুর্ব্বেদ ভারতী পত্রিকা বলেন :—

'গ্রন্থকার সুনিপুনভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় চিকিৎসক এবং অচিকিৎসক সর্ব্ব সাধারণের জন্য আয়ুর্ব্বেদের পূর্ণাঙ্গ না হলেও অনেক বিষয়ে সম্বিলিত গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের গূঢ় তথ্য প্রসারে সাহায্য করিয়াছেন।

দেশ পত্রিকা বলেন :—

চিকিৎসা শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য। কবিরাজ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদের মূলভিত্তির সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের যে নীতিগত পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তা' বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। সাম্প্রতিক কালে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রের পুনরুজ্জীবনের জন্য গ্রন্থকার দীর্ঘকালের গবেষণার দ্বারা চিকিৎসা পদ্ধতিকে স্বকীয় ভিত্তি ভূমিতে যুগোপযোগী করতে সক্ষম হয়েছেন।

গ্রন্থটি সমস্ত চিকিৎসক সমাজ, শিক্ষার্থী ও গৃহস্থ পরিবারবর্গের বিশেষ উপকারে আসবে। জনকল্যাণে গ্রন্থটির প্রচার ও প্রসার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

'চলচ্চিত্র' নাটক সম্বন্ধে অভিমত

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) বলেন ঃ—

কবিরাজ শ্রীমান বীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'চলচ্চিত্র' নাটকখানি পড়িলাম। লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ .....

সমালোচক শ্রেষ্ঠ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক, শনিবারের চিঠির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনী কান্ত দাস বলেন ঃ—

"কবিরাজ শ্রীবীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় কবিরত্নের তিন অঙ্কের সামাজিক নাটক 'চলচ্চিত্র খানি' পড়িলাম, লেখকের সৃষ্টি ক্ষমতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হ'য়েছি, নাটক হিসাবে রঙ্গমঞ্চে বইখানি কতখানি সফলতা লাভ করবে তা' বোঝবার ক্ষমতা আমাদের নেই, কিন্তু সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে বইখানি সুখপাঠ্য হ'য়েছে তা' বলতে পারি।"

যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন :—

"সমাজ-কল্যানের সদিচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া নাট্যকার এই নাটক -খানি রচনা করিয়াছেন। নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিকেও লেখকের সজাগ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনার সংঘাতে এবং কাহিনীর অভি-নবত্বে নাটক খানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। সংলাপ মনোহারী না হইলেও বৈশিষ্ট বর্জ্জিত নহে। লেখকের এই প্রথম প্রচেষ্টা, অধ্যবসায় সহকারে অগ্রসর হইলে সাহিত্য জগতে স্বীয় স্বাক্ষর রাখিতে পারিবেন।"

কবিশেখর কালিদাস রায় বলেন ঃ—

"চলচ্চিত্র" লেখা আমার ভাল লাগিয়াছে সম্পূর্ণ নাট্যকলা সম্মত হইয়াছে কিনা জানিনা, তবে লেখা সাহিত্য পদবাচ্য হইয়াছে। লেখক জীবনের অভিজ্ঞতাকে যে সরস বাণীর রূপ দিয়াছেন তাহা সকল পাঠকেরই

উপভোগ্য হইবে।"

কবিবর কুমুদ রঞ্জন মল্লিক বলেন :—

"চলচ্চিত্র" বই খানিতে ভাষা আছে, ভাব আছে, নতুন দৃষ্টি ভঙ্গি আছে। অনেক জায়গায় আমার খুবই ভাল লাগিয়াছে। বঙ্গ সাহিত্যে লেখকের বংশগত দাবী আছে। লেখকের অভিযান জয়যুক্ত হোক।"

ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) বলেন :—

" 'চলচ্চিত্র' নাটকখানি পড়ে দেখেছি। মন্দ হয়নি লেখকের শক্তি আছে।"

কথাশিল্পী বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :—

"আপনার বই লেখা সার্থক হ'য়েছে এজন্যে যে, যেখানে একদিনও বিশ্রাম পাবার উপায় নেই, কাল সকালে 'চলচ্চিত্র' নাটক খানি এক নিশ্বাসে প'ড়ে ফেলেছি। সুলেখার চরিত্র আপনার সার্থক সৃষ্টি, যদিও ইলা ও তরণী সমান ভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্থানীও তরুণ সমিতির সভ্যগণ এই বইখানি আমার নিকট চেয়েছে, ঝুলন পূর্ণিমাতে টাউন হলে অভিনয় করবে।"

স্বনাম ধন্য সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায় বলেন :—

"আপনি সামাজিক নাটক লিখিয়াছেন, সেজন্য দরদ দিয়া সমাজের ভুল ত্রুটি গুলি বেশ ভাল করিয়াই দেখিয়া লইয়াছেন, যে পথে সমাজের মুক্তি আর কল্যান তাহাও আপনার সহানুভূতি পূর্ণ দৃষ্টির সামনে বেশ ভাল ভাবেই পরিস্ফুট। সেই জন্য নাটকের মধ্যে যে আপনার সংস্কারকের রূপটি ধরা পড়ে তাহার মধ্যে উগ্রতা নেই, সেরূপ বেশ প্রীতি স্নিগ্ধ যদিও বেদনাতুর। লেখার মধ্যেও আমি বেশ শক্তির পরিচয় পাইয়াছি। নাটকের যে একটি প্রধান উপাদান সংলাপ তাহাতে আপনার হাত আছে, Dramatic Situation মাঝে মাঝে ভালই সৃষ্টি করিয়াছেন।"

প্রথিত যশা, ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফনীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন :—

" 'চলচ্চিত্র' বইখানিতে গ্রাম ও শহরের সভ্যতার চিত্র পাশাপাশি দেখাইয়া ইহাদের তুলনা মূলক সমালোচনা করিয়াছেন। নাটকটি আজকালকার অভিনয়ের উপযোগী। কিছু সংযোজন করিলে সিনেমায় প্রদর্শিত হইতে পারে। লেখক সাহিত্য ক্ষেত্রে নবাগত হইলেও তাঁহার লেখনীর বাঁধন ও বৈশিষ্ট পাঠক মাত্রকেই মুগ্ধ করিবে। তাঁহার অঙ্কিত সুলেখা ও তরণীর চিত্র মধুর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

নাট্যকার ও নাট্য-ভারতীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :—

"চলচ্চিত্র" নাটকখানির নামটি কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় বস্তুর মতই মনোজ্ঞ হইয়াছে; পড়িতে বসিলে পাঠকের চক্ষুর উপর বাস্তব ও জীবন্ত চিত্র গুলি ঘুরা ফিরা করিতে করিতে মনের পাতায় যে দাগ আঁকিয়া দিয়া যায়, পড়ার পরও তাহা মুছিয়া যায় না। আধুনিক পাঠকরা যাহা চায় বইখানির মধ্যে লেখক যেন ওজন করিয়াই সে গুলি যোগাইয়া দিয়াছেন।"

'অনুভব' পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত

A. B. T. A. Teacher's Journal বলেন :—

" 'অনুভব' বইখানিতে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা আছে। প্রবন্ধ গুলির রচনাশৈলী এবং যুক্তি পূর্ণতা প্রশংসনীয়। এই পুস্তকখানিও পাঠকের নিকট সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।"

মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ও নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক বলেন :—

"শ্রীবীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধয় লিখিত 'অনুভব' বইখানি প্রশ্নাবলীতে ও প্রবন্ধে লেখকের ভাবধারা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। লেখকের প্রকাশ [illegible] শক্তিশালী, ভাষা প্রাঞ্জল।"